আপনার ঈমান কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য?

(সংশয় নিরসন)

মূল : মুহাম্মাদ বিঁন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

আপনার ঈমান কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য?
(সংশয় নিরসন)

মূল : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

অনুবাদ ও সম্পাদনায় : বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন, সিলেট

আপনার ঈমান কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য?

(সংশয় নিরসন)

মূল : মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)

অনুবাদ ও সম্পাদনায়

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

প্রকাশক

পাণ্ডুলিপি প্রকাশন

মানিকপীর রোড, কুমারপাড়া, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১২৮৬৮৩২৯

প্রকাশকাল

অক্টোবর ২০১১

পরিবেশক

ইন্সটিটিউট ফর কমিউনিটি ডেভোলপমেন্ট (ICD)

১৪/৮, ইকবাল রোড (৩য় তলা), মোহাম্মদপুর, ঢাকা।

এডুকেশন সেন্টার সিলেট (ECS)

পশ্চিম সুবিদবাজার, সুনামগঞ্জ রোড, সিলেট

মোবাইল : ০১৭১২-৬৬৮৩৪৫

সালেহ্ বুক স্টল

হাজী কুদরতউল্লাহ মার্কেট (২য় তলা), সিলেট

প্রচ্ছদ

মোহাম্মদ হাসানুজ্জামান

অক্ষরবিন্যাস

মোঃ আব্দুল মুমিন

মুদ্রণ

পাণ্ডুলিপি প্রিন্টিং অ্যান্ড প্যাকেজিং, সিলেট

মূল্য

৩০ টাকা

Apnar Eeman Ki Allahor Kache Grohonjuggo (Shongshoy Niroshon), by Muhammad Bin Sulaiman Attamimi (R.) Edited by : Bayjid Mahmud Foysol, Published by Pandulipi Prokashon, Sylhet. Price : Tk 30

ISBN : 978-984-8922-10-1

প্রসঙ্গ : পূর্বকথা

'ইন্নাল হাম্‌দা লিল্লাহ। ওয়াস্‌সালাতু ওয়াস্‌সালামু 'আলা রাসুলিল্লাহ (সা.)।' সমস্ত প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য যিনি মানুষকে সর্ববিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও শিক্ষা দিয়ে তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক বিশ্বমানবতার মুক্তির অগ্রদূত মুহাম্মদ (সা.)-এর উপর। যিনি আমাদের সামনে দ্বীনকে পরিপূর্ণরূপে উপস্থাপন করেছেন। ইসলামই কিয়ামত পর্যন্ত একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে অবশিষ্ট থাকবে। এমতাবস্থায় দুনিয়ার শান্তি ও আখেরাতের মুক্তি লাভের জন্য আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে।

বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.)-এর 'সংশয় নিরসন' গ্রন্থটি মুসলিম উম্মাহর পরিশুদ্ধির জন্য যুগ যুগ ধরে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। গ্রন্থটিতে লেখক কুরআন সুন্নাহর আলোকে একজন মুসলিমের সহীহ আকীদা বর্ণনা ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য দিক্‌নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেছেন। বইটি ব্যাপক পাঠকপ্রিয়তার কারণে বিভিন্ন সময় বিশ্বের বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশ এবং বাংলাভাষায় এর কয়েকটি সংস্করণও প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে বাংলাভাষী পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থটির ব্যাপক চাহিদা থাকায় কিছুসংখ্যক দ্বীনি ভাইদের অনুরোধে এর পুনঃমুদ্রণ করা হলো। নতুন সংস্করণে হাদিসের নাম্বারগুলো 'মাক্‌তাবাতুস শামিলা' সফ্‌টওয়্যার থেকে নেওয়া হয়েছে। এ গ্রন্থটি প্রকাশে যারা আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করেছেন তাদের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। মহান আল্লাহ আমাদের এ প্রচেষ্টাকে দুনিয়ার কামিয়াবী ও আখিরাতে নাজাতের উসিলা হিসেবে কবুল করে নিন। আমীন

সিলেট
অক্টোবর ২০১১

বায়েজীদ মাহমুদ ফয়সল

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	: রসুলগণের প্রথম দায়িত্ব ইবাদাতে আল্লাহর একত্বের প্রতিষ্ঠা	৫
দ্বিতীয় অধ্যায়	: তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ বনাম তাওহীদ ফীল ইবাদাহ	৬
তৃতীয় অধ্যায়	: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ এর প্রকৃত তাৎপর্য	৯
চতুর্থ অধ্যায়	: তাওহীদের জ্ঞান লাভ আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত	১১
পঞ্চম অধ্যায়	: জ্বীন ও মানুষের শত্রুতা-নবী ও ওলীদের সাথে	১৩
ষষ্ঠ অধ্যায়	: কিতাব ও সুন্নাহর অস্ত্র সজ্জা	১৪
সপ্তম অধ্যায়	: বাতিল পন্থীদের দাবীসমূহের খণ্ডন	১৬
অষ্টম অধ্যায়	: দোয়া ইবাদাতের মূল	২২
নবম অধ্যায়	: শরীয়াত সম্মত শাফায়াত এবং শির্কী শাফায়াতের মধ্যে পার্থক্য	২৪
দশম অধ্যায়	: নেক লোকদের নিকট বিপদ আপদে আশ্রয় প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন করা শির্ক	২৬
একাদশ অধ্যায়	: আমাদের যুগের লোকদের শির্ক অপেক্ষা পূর্ববর্তী যুগের লোকদের শির্ক ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা	৩০
দ্বাদশ অধ্যায়	: ফরয-ওয়াজিব পালনকারী ব্যক্তি ও কাফির হতে পারে	৩৩
ত্রয়োদশ অধ্যায়	: যে সকল মুসলিম শির্ক করার ইচ্ছা পোষণ করে অতঃপর তাওবাহ্ করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম	৩৯
চতুর্দশ	: 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়	৪০
পঞ্চদশ অধ্যায়	: জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে **পার্থক্য**	৪৩
ষোড়শ অধ্যায়	: তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও অপারগতার পরিচয়	৪৫

প্রথম অধ্যায়

রসুলগণের প্রথম দায়িত্ব : ইবাদাতে আল্লাহর এককত্ত্ব প্রতিষ্ঠা

প্রথমেই জেনে রাখা প্রয়োজন যে, তাওহীদের অর্থ 'ইবাদাতকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লার জন্যই এককভাবে সুনির্দিষ্ট করা আর এটাই হচ্ছে আল্লাহর প্রেরিত রসুলগণের দ্বীন-যে দ্বীনসহ আল্লাহ তাঁদেরকে প্রেরণ করেছিলেন। সেই রসুলগণের প্রথম হচ্ছেন নূহ (আ.)। আল্লাহ তাঁকে তার জাতির নিকট সেই সময় পাঠালেন যখন তারা ওয়াদ, সুওয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাসর নামীয় কতিপয় সৎলোকের ব্যাপারে অতি মাত্রায় বাড়াবাড়ি করে চলেছিল। আর সর্বশেষ রসুল হচ্ছেন হযরত মুহাম্মদ (সা.) যিনি ওই সব নেক লোকদের মূর্তি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করেন। আল্লাহ তাঁকে এমন সব লোকের মধ্যে পাঠান যারা 'ইবাদাত করতো, হজ্ব করতো, দান খয়রাত করতো এবং আল্লাহকেও অধিক মাত্রায় স্মরণ করতো। কিন্তু তারা কোন কোন সৃষ্ট ব্যক্তি ও বস্তুকে আল্লাহ এবং তাদের মাঝে মাধ্যম রূপে দাঁড় করাতো। তারা বলতো, তাদের মধ্যস্থতায় আমরা আল্লাহর নৈকট্য কামনা করি আর আল্লাহর নিকট (আমাদের জন্য) তাদের সুপারিশ কামনা করি। তাদের এই নির্বাচিত মাধ্যমগুলো হচ্ছে : ফেরেশতা, ঈসা (আ.), মারইয়াম (আ.) এবং মানুষের মধ্যে যাঁরা সৎকর্মশীল আল্লাহর নেক বান্দা। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ প্রেরণ করলেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে তাঁর পূর্বপুরুষ হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর দ্বীনকে নব প্রাণশক্তিতে উজ্জীবিত করার জন্য। তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের এই পথ এবং এই প্রত্যয় একমাত্র আল্লাহরই হক্ব। এর কোনটিই আল্লাহর নৈকট্য লাভে-ধন্য কোন ফেরেশতা এবং কোন প্রেরিত রসুল এর জন্যও সিদ্ধ নয়। অন্যদের কথা বলাই বাহুল্য। তাছাড়া ওই সব মুশরিকগণ সাক্ষ্য দিতো যে, আল্লাহ একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, সৃষ্টিতে তাঁর কোন শরিক নেই। বস্তুতঃ তিনিই একমাত্র রিযিকদাতা, তিনি ছাড়া রিযিক দেওয়ার আর কেউ নেই। জীবনদাতাও একমাত্র তিনিই, আর কেউ জীবন দিতে সক্ষম নয়। তিনিই মৃত্যু দেন, আর কেউ মৃত্যু দিতে পারে না। বিশ্বজগতের একমাত্র পরিচালকও তিনিই, আর কারোরই পরিচালনার ক্ষমতা নেই। সাত আকাশ ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিরাজমান এবং সাত স্তবক জমিন ও যা কিছু তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে সবকিছুই তাঁরই অনুগত দাস সবই তাঁর ব্যবস্থাধীন এবং সবকিছুই তাঁরই প্রতাপে এবং তাঁরই আয়ত্তাধীনে নিয়ন্ত্রিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়
তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ বনাম তাওহীদ ফিল ইবাদাহ

রসুলুল্লাহ (সা.) যে সব মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তারা তাওহীদ আর-রবুবিয়্যাহ অর্থাৎ আল্লাহ যে মানুষের রব-প্রতিপালক এ কথা স্বীকার করতো কিন্তু এই স্বীকৃতি ইবাদাতে শিরক্ থেকে তাদেরকে বের করে আনতে পারেনি-আলোচ্য অধ্যায়ে তারই বিশদ বিবরণ দিতে চাই।

যে সব কাফিরের সঙ্গে আল্লাহর রসুল (সা.) যুদ্ধ করেছেন তারা (কোন কোন ব্যাপারে) তাওহীদে রবুবিয়াতের সাক্ষ্য প্রদান করতো এই কথার প্রমাণ যদি আপনি চান তবে নিম্নলিখিত আল্লাহর বাণী পাঠ করুন :

قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ والأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللّهُ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ (يونس : 31)

'তাদের জিজ্ঞেস কর, আকাশ আর যমীন হতে কে তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে? কিংবা শ্রবণশক্তি ও দর্শনশক্তি কার মালিকানাধীন? আর মৃত থেকে জীবিতকে কে বের করেন আর কে মৃতকে জীবিত থেকে বের করেন? যাবতীয় বিষয়ের শাসন ও নিয়ন্ত্রণ কার অধীনস্থ? তারা বলে উঠবে, 'আল্লাহ'। তাহলে তাদেরকে বল, তবুও তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করবে না?' (সুরা-ইউনুস : ৩১)

আল্লাহ তাআ'লা আরো বলেছেন :

قُل لِّمَنِ الْأَرْضُ وَمَن فِيهَا إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ - قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ - قُلْ مَن بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ - سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ (المؤمنون : 84-89)

'বল : এ পৃথিবী আর তার ভিতরে যা আছে তা কার? (বল) যদি তোমরা জান! তারা বলবে–আল্লাহ্‌র। বল : তবুও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবে না? বল : সাত আসমান আর মহান আরশের মালিক কে? তারা বলবে : (এগুলোর মালিকানা) আল্লাহ্‌র। বল : তবুও কি তোমরা (আল্লাহ্‌কে) ভয় করবে না? বল : সবকিছুর একচ্ছত্র কর্তৃত্ব কার হাতে? তিনি (সকলকে) আশ্রয় দেন, তাঁর উপর কোন আশ্রয়দাতা নেই, (বল) তোমরা যদি জান। তারা বলবে (সকল কিছুর কর্তৃত্ব) আল্লাহ্‌র। তাহলে কেমন করে তোমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়ছ?' (সূরা-আল-মু'মিনুন : ৮৪-৮৯)

অনুরূপ আরো অনেক আয়াত রয়েছে।

যখন এ সত্য স্বীকৃত হলো যে, তারা আল্লাহর রুবুবিয়াতের গুণাবলি কোন কোন ক্ষেত্রে মেনে নিয়েছিল অথচ আল্লাহর রসুল (সা.) তাদেরকে সেই তাওহীদের অন্তর্ভুক্ত করেননি-যার প্রতি তিনি আহ্বান জানিয়ে ছিলেন। আর আপনি এটাও অবগত হলেন যে, যে তাওহীদকে তারা অস্বীকার করেছিল সেটা ছিল তাওহীদে ইবাদাহ্ (ইবাদাতে আল্লাহর একত্ববাদ প্রতিষ্ঠিত করা)–আমাদের যুগের মুশরিকগণ যাকে 'ইতেকাদ' বলে থাকে। তাদের ওই 'ইতেকাদ'-এর নমুনা ছিল এই যে, তারা আল্লাহকে দিবানিশি আহ্বান করতো আর তাদের অনেকেই আবার ফেরেশতাদেরকে এজন্য আহ্বান করতো যে, ফেরেশতাগণ তাদের সৎ স্বভাব ও আল্লাহর নৈকট্যে অবস্থান হেতু তাদের মুক্তির জন্য সুপারিশ করবে; অথবা তারা কোন পুণ্য-স্মৃতি ব্যক্তি বা নবীকে ডাকতো যেমন 'লাত' বা হযরত ঈসা (আ.)-কে।

আর এটাও আপনি জানতে পারলেন যে, রসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সঙ্গে এই প্রকার শিরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এবং তাদেরকে দাওয়াত দিয়েছেন যেন তারা এক আল্লাহর জন্যই তাদের ইবাদাতকে খালিস (নির্ভেজাল) করে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা ঘোষণা করেছেন :

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (الجن : 18)

'আরো এই যে, মসজিদগুলো কেবলমাত্র আল্লাহ্‌রই জন্য, কাজেই তোমরা আল্লাহ্‌র সঙ্গে অন্য আর কাউকে ডেকো না।' (সুরা-আল-জ্বীন : ১৮)

এবং তিনি একথাও বলেছেন :

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لاَ يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بِشَيْءٍ

'সত্যিকার আহ্বান-প্রার্থনা তাঁরই প্রাপ্য, যারা তাঁকে ছাড়া অন্যকে ডাকে, তারা তাদের কোনই জবাব দেয় না।' (সুরা-আর-রা'দ : ১৪)

এটাও বাস্তব সত্য যে, রসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সঙ্গে এই জন্যই যুদ্ধ করেছেন যেন তাদের যাবতীয় দোয়া আল্লাহর জন্য হয়ে যায়; যাবতীয় কোরবানিও আল্লাহর জন্যই নিবেদিত হয়, যাবতীয় নজর-নিয়াজও আল্লাহর জন্যই উৎসর্গিত হয়; সমস্ত আশ্রয় প্রার্থনা আল্লাহর সমীপেই করা হয় এবং সর্ব প্রকার ইবাদাহ্ আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট হয়।

এবং আপনি এটাও অবগত হলেন যে, তাওহীদে রবুবিয়াত সম্বন্ধে তাদের এই স্বীকৃতি তাদেরকে ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করায়নি এবং ফেরেশতা, নবী ও ওলীগণের সাহায্য প্রার্থনার মাধ্যমে সুপারিশ লাভের ইচ্ছা ও আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের বাসনা এমন মারাত্মক অপরাধ যা তাদের জান-মালকে মুসলিমদের জন্য হালাল করে দিয়েছিল।

এখন আপনি অবশ্য বুঝতে পারছেন যে, আল্লাহর রসুলগণ কোন তাওহীদের প্রতি দাওয়াত দিয়েছিলেন ও মুশরিকগণ তা কেন প্রত্যাখ্যান করেছিলো।

তৃতীয় অধ্যায়
'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত তাৎপর্য

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর প্রকৃত তাৎপর্য হচ্ছে ইবাদাতে তাওহীদ। বর্তমান যুগে ইসলামের দাবিদারগণের তুলনায় রসুলুল্লাহ (সা.) সময়ের কাফিরগণ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর অর্থ বেশি ভাল জানতো। এই অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হচ্ছে :

কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ ও তাৎপর্য বলতে যা বুঝায় তাই হচ্ছে ইবাদাতে তাওহীদ। কেননা তাদের নিকট 'ইলাহ' হচ্ছেন সেই সত্তা যাকে বিপদে আপদে ডাকা হয়, যার জন্য নজর-নিয়াজ পেশ করা হয়, যার নামে পশু-পাখি যবেহ করা হয় এবং যার নিকট আশ্রয় চাওয়া হয়। কিন্তু এই সব বিষয় যদি ফেরেশতা, নবী, ওলী, বৃক্ষ, কবর, জ্বীন প্রভৃতির জন্য করা হয়, তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তাদেরকেই 'ইলাহ'-এর আসনে বসানো হয়। নবীগণ কাফিরদেরকে এ কথা বুঝানোর প্রয়োজনবোধ করেননি যে, আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা, আহারদাতা এবং সমস্ত কিছুর ব্যবস্থাপক পরিচালক। কেননা কাফিররা এটা জানতো এবং স্বীকার করতো যে, এইসব গুণাবলি অর্থাৎ সৃষ্টি করা, আহার দান এবং ব্যবস্থাপনা একমাত্র একক আল্লাহর জন্যই সুনির্দিষ্ট-আর কারোরই তা করার ক্ষমতা নেই। (এ সম্পর্কে বিশদ আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি) এছাড়া সে যুগের মুশরিকগণ 'ইলাহ'-এর সেই অর্থই বুঝত যা আজ কালের মুশরিকগণ 'সাইয়েদ', 'মুর্শিদ' ইত্যাদি শব্দ দ্বারা বুঝে থাকে। নবী করিম (সা.) তাদের নিকটে যে কালিমায়ে তাওহীদের জন্য আগমন করেছিলেন সেটা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আর এই কালিমার প্রকৃত তাৎপর্যই হচ্ছে এর আসল উদ্দেশ্য, শুধুমাত্র এর শব্দগুলিই উদ্দেশ্য নয়।

অজ্ঞ কাফিরগণও এ কথা জানতো যে, এই কালিমা দ্বারা নবী করিম (সা.) -এর উদ্দেশ্য ছিল : যাবতীয় সৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে আল্লাহর সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করা (তাঁর সঙ্গে বান্দার একমাত্র সম্পর্ক খালিক ও মাখলুক তথা মাবুদ ও

আব্দের সম্পর্ক), তাঁকে ছেড়ে আর যাকে বা যে বস্তুকে উপাসনা করা হয় তা সম্পূর্ণ অস্বীকার করা এবং এর থেকে তাঁকে সম্পূর্ণ পাক ও পবিত্র রাখা। কেননা যখন রসুলুল্লাহ (সা.) কাফিরদের লক্ষ্য করে বললেন, তোমরা বলো : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'—ইবাদাত পাওয়ার যোগ্য সত্য কোন ইলাহ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া, তখন তারা বলে উঠল :

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَٰهًا وَاحِدًا إِنَّ هَٰذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (ص: 5)

'সে কি সব ইলাহকে এক ইলাহ বানিয়ে ফেলেছে? এটা বড়ই আশ্চর্য ব্যাপার তো!' (সুরা-সা'দ : ৫)

যখন আপনি জানতে পারলেন যে, জাহিল কাফিরগণও কালিমার অর্থ বুঝে নিয়েছিল, তখন এটা কত বড় আশ্চর্যের বিষয় যে, ইসলামের (বর্তমান) দাবিদারগণ তাও বুঝে উঠতে সক্ষম হচ্ছে না। বরং এরা মনে করছে কালিমার আক্ষরিক উচ্চারণই যথেষ্ট, তার প্রকৃত অর্থ ও তাৎপর্য উপলব্ধি করে অন্তর দিয়ে প্রত্যয় পোষণ করার প্রয়োজন নেই।

অতএব, ওই মুসলিম নামধারীর মধ্যে কি কল্যাণ থাকতে পারে যার চেয়ে আবু জাহেল ও অন্যান্য কাফিরও কালিমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ বেশি বুঝতো?

চতুর্থ অধ্যায়

তাওহীদ এর জ্ঞানলাভ আল্লাহর এক বিরাট নিয়ামত

এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয় তাওহীদ সম্পর্কে মু'মিনের জ্ঞান লাভ তার প্রতি আল্লাহর এমন এক নিয়ামত যে জন্য আনন্দ প্রকাশ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং এর থেকে বঞ্চনা তার জন্য ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

নিম্নোক্ত চারটি বক্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান লাভের পর আপনি দুটি বিষয়ে উপকৃত হতে পারবেন। বক্তব্যগুলো হলো এই :

১. 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে আন্তরিক প্রত্যয়।

২. আল্লাহর সঙ্গে শিরক করার ভয়াবহ পরিণতি যে সম্বন্ধে তিনি নিজেই ঘোষণা করেছেন :

إِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا

'নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেন না। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছে মাফ করবেন এবং যে আল্লাহ্র সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল।' (সুরা-আন্-নিসা : ৪৮)

৩. প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত নবীগণ যে দ্বীন সহ প্রেরিত হয়েছেন সে দ্বীন ছাড়া আল্লাহ অন্য কোন দ্বীনই কবুল করবেন না।

৪. আর অধিকাংশ লোক দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞ।

এখন যে দুটি বিষয়ে আপনি উপকৃত হতে পারবেন তা হলো এই :

এক. আল্লাহর দান ও তাঁর রহমতের উপর সন্তুষ্টি লাভ করা। যেমন–আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (يونس : 58)

'বল, আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়ার বদৌলতে (তা এসেছে), এজন্য তারা আনন্দিত হোক। তারা যা স্তুপীকৃত করছে তার চেয়ে তা (অর্থাৎ হিদায়াত ও রহমাতপূর্ণ কুরআন) উত্তম।' (সুরা-ইউনুস : ৫৮)

দুই. আপনি এর থেকে ভীষণ ভয়ের কারণও বুঝতে পারলেন। কেননা যখন আপনি বুঝতে পারলেন যে, মানুষ তার মুখ থেকে একটা কুফরী কথা বের করে, সে উক্ত কথাটি অজ্ঞতাবশতঃ বলে ফেলে তবু তার কোন ওজর আপত্তি খাটে না। এই যখন প্রকৃত অবস্থা, তখন যে ব্যক্তি মুশরিক্দের আকীদার অনুরূপ আকীদাহ পোষণ করে, আর বলে থাকে যে, অমুক কথা আমাকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেবে তখন তার অবস্থা কি হতে পারে? এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হচ্ছে, আল-কুরআনে বর্ণিত হযরত মুসা (আ.)-এর ঘটনাটি, যে ঘটনায় মুসা (আ.)-এর সম্প্রদায় সৎ ও জ্ঞানী গুণী হওয়া সত্ত্বেও বলেছিল :

اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (الاعراف : 138)

'আমাদের জন্যও কোন ইলাহ্ বানিয়ে দাও যেমন তাদের ইলাহ আছে।'

(সুরা-আল-আ'রাফ : ১৩৮)

অতএব, উপরে বর্ণিত ঘটনাটি অনুরূপ বিষয় হতে বেঁচে থাকতে আপনাকে সাহায্য করবে।

পঞ্চম অধ্যায়

জ্বীন-মানুষের শত্রুতা নবী ও ওলীদের সাথে

আলোচ্য বিষয় : আল্লাহর নবী এবং আল্লাহর ওলীদের বিরুদ্ধে মানুষ এবং জ্বিনদের মধ্য হতে অনেক দুশমন থাকার পেছনে ক্রিয়াশীল রয়েছে আল্লাহর হিকমাহ্।

জেনে রাখুন, আল্লাহ তাআ'লার অন্যতম হিকমাহ্ এই যে, তিনি এই তাওহীদের প্রচারকরূপে এমন কোন নবী প্রেরণ করেন নি যার পেছনে শত্রু দাঁড় করিয়ে দেন নি।

আল্লাহ তাঁর পাক কালামে বলেছেন :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (الانعام : 112)

'এভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য মানুষ আর জ্বীন শয়তানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি, প্রতারণা করার উদ্দেশে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে।' (সুরা-আল-আন'আম : ১১২)

আবার কখনও তাওহীদের শত্রুদের নিকটে থাকে অনেক জ্ঞান, বহু কিতাব ও বহু যুক্তি প্রমাণ।

যেমন আল্লাহ্ বলেছেন :

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ (المؤمن : 83)

'তাদের কাছে যখন তাদের রসুলগণ স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসে, তখন তারা তাদের নিজেদের কাছে যে জ্ঞান ও বিদ্যা ছিল তাতেই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।'
(সুরা-আল-মু'মিন : ৮৩)

ষষ্ঠ অধ্যায়

কিতাব ও সুন্নাহ্‌র অস্ত্রসজ্জা

আলোচ্য বিষয় : মুশরিকদের সৃষ্ট সন্দেহাদি দূরীকরণের জন্য একজন মুসলিমকে আল কুরআন ও সুন্নাহর অস্ত্রসজ্জায় সজ্জিত থাকতে হবে।

যখন আপনি জানতে পারলেন যে, নবী ও ওলীদের পেছনে শত্রু নিয়োজিত রয়েছে আর এ কথাও জানতে পারলেন যে, আল্লাহর পথের মোড়ে উপবিষ্ট দুশমনগণ হয়ে থাকে কথার জাদুকর, তথাকথিত জ্ঞানী ও তর্কবাগিস তখন আপনার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে আল্লাহর দ্বীন থেকে সে সব বিষয় শিক্ষা গ্রহণ করা যা আপনার জন্য হয়ে উঠবে এমন এক কার্যকর অস্ত্র যে অস্ত্র দিয়ে আপনি ওই শয়তানদের সঙ্গে মোকাবিলা এবং সংগ্রাম করতে সক্ষম হবেন।

মুশরিকদের অগ্রদূত ও তাদের নেতা শয়তান, আপনার মহান ও মহীয়ান রব পরওয়ারদিগারকে বলেছিল :

لأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ - ثُمَّ لآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَآئِلِهِمْ وَلاَ تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (الاعراف : 16-17)

'সে বলল, যেহেতু (পথ থেকে) আমাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছো, কাজেই আমি অবশ্যই তোমার সরল পথে মানুষদের জন্য ওৎ পেতে থাকব। তারপর আমি তাদের সামনে দিয়ে, তাদের পেছন দিয়ে, তাদের ডান দিয়ে, তাদের বাম দিয়ে তাদের কাছে অবশ্যই আসব, তুমি তাদের অধিকাংশকেই শোকর আদায়কারী পাবে না।' (সুরা-আল-আ'রাফ : ১৬-১৭)

কিন্তু যখন আপনি আল্লাহর পানে অগ্রসর হবেন ও আল্লাহর দলিল প্রমাণাদির প্রতি আপনার হৃদয়-মন ও চোখ-কানকে ঝুকিয়ে দিবেন, তখন আপনি হয়ে উঠবেন নির্ভীক ও নিশ্চিন্ত। কারণ তখন আপনি আপনার জ্ঞান ও যুক্তি প্রমাণের মোকাবিলায় শয়তানকে দুর্বল দেখতে পাবেন। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন :

إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا (النساء : 76)

'নিশ্চয় শয়তানের চক্রান্ত ও কূট-কৌশল হচ্ছে অতি দুর্বল।' (সুরা-আন-নিসা : ৭৬)

একজন সাধারণ তাওহীদবাদী (মুসলিম) ব্যক্তি হাজার মুশরিক্ পণ্ডিতের উপর জয় লাভের সামর্থ্য রাখে। আল-কুরআন বজ্রগম্ভীর ভাষায় ঘোষণা করেছে :

وَإِنَّ جُندَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (الصافات : 173)

'আর আমার সৈন্যরাই বিজয়ী হবে।' (সুরা-আস্-সাফ্ফাত : ১৭৩)

আল্লাহর দল যুক্তি ও কথার বলে জয়ী হয়ে থাকেন, যেমন তারা জয়ী হয়ে থাকেন তলোয়ার ও অস্ত্র বলে। ভয় ওইসব মুসলিমদের জন্য যারা বিনা অস্ত্রে পথ চলেন। অথচ আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে এমন এক কিতাব দ্বারা অনুগৃহীত করেছেন যার ভেতর তিনি প্রত্যেক বিষয়ের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন এবং যে কিতাবটি হচ্ছে স্পষ্ট ব্যাখ্যা যা মুসলিমদের জন্য পথ-নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ। ফলে বাতিল পন্থীগণ যে কোন দলিল নিয়েই আসুক না কেন তার খণ্ডন এবং তার অসারতা প্রতিপাদন করার মত যুক্তি প্রমাণ খোদ আল কুরআনেই বিদ্যমান রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেন :

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (الفرقان : 33)

'তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসে না যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি।' (সুরা-আল-ফুরকান : ৩৩)

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় কতিপয় মুফাস্সির বলেছেন : 'কিয়ামত পর্যন্ত বাতিলপন্থীরা যে যুক্তিই উপস্থাপিত করুক, এই আয়াত সামগ্রিকভাবে জানিয়ে দিচ্ছে যে, আল-কুরআন তা খণ্ডনের শক্তি রাখে।'

সপ্তম অধ্যায়
বাতিল পন্থীদের দাবিসমূহের খণ্ডন
(সংক্ষিপ্তাকারে ও বিস্তারিতভাবে)

আমাদের সমসাময়িক যুগের মুশরিকগণ যেসব যুক্তিতর্কের অবতারণা করে থাকে আমি তার প্রত্যেকটির জবাবে সেই সব কথাই বলবো যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন।

বাতিলপন্থীদের কথার জবাব আমরা দুই পদ্ধতিতে প্রদান করব :
১. সংক্ষিপ্তাকারে ২. তাদের দাবিসমূহ বিশ্লেষণ করে বিশদভাবে।

১. সংক্ষিপ্ত জবাব : আকারে সংক্ষিপ্ত হলেও এটা হবে অতীব গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত কল্যাণবহ সেই সব ব্যক্তির জন্য যাদের প্রকৃত বোধ-শক্তি আছে। আল্লাহ বলেন :

هُوَ الَّذِيَ أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ في قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاء تَأْوِيلِهِ (آل عمران : 7)

'তিনিই তোমার উপর এমন কিতাব নাযিল করেছেন, যার কতিপয় আয়াত মৌলিক-সুস্পষ্ট অর্থবোধক, এগুলো হল কিতাবের মূল আর অন্যগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়; কিন্তু যাদের অন্তরে বক্রতা আছে, তারা গোলযোগ সৃষ্টির উদ্দেশে এবং ভুল ব্যাখ্যার উদ্দেশে উক্ত আয়াতগুলোর অনুসরণ করে যেগুলো পুরোপুরি স্পষ্ট নয়। মূলতঃ এর মর্ম আল্লাহ ছাড়া কেউই জানে না। যারা জ্ঞানে সুগভীর তারা বলে যে, আমরা তার উপর ঈমান এনেছি, এ সবকিছুই আমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে, মূলতঃ জ্ঞানবান ব্যক্তিরা ছাড়া কেউই নসীহত গ্রহণ করে না।' (সুরা-আ'লি-ইমরান : ৭)

নবী করিম (সা.) হতেও এটা সাব্যস্ত হয়েছে। তিনি বলেছেন : 'যখন তুমি ওই সমস্ত লোকদের দেখবে যারা দ্ব্যর্থবোধক ও অস্পষ্ট আয়াতগুলির অনুসরণ করছে তখন বুঝে নেবে এরা সেই সব লোক যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ আলোচনা করেছেন। ওইসব লোকদের ব্যাপারে তোমরা হুঁশিয়ার থাকো।'

(সহীহ বুখারী : ৪২৭৩ ও সহীহ মুসলিম : ৬৯৪৬)

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে মুশরিকদের মধ্যে কিছু লোক বলে থাকে :

اَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (يونس : 62)

'জেনে রেখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।'
(সুরা-ইউনুস : ৬২)

তারা আরও বলে : সুপারিশের ব্যাপারটি অবশ্যই সত্য; অথবা বলে : আল্লাহর নিকটে নবীদের একটা বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। কিংবা নবী করিম (সা.)-এর এমন কিছু কথা তারা উল্লেখ করবে যা থেকে তারা তাদের বাতিল বক্তব্যের পক্ষে দলিল পেশ করতে চাইবে, অথচ আপনি বুঝতেই পারবেন না, যে কথার তারা অবতারণা করছে তার অর্থ কি?

এরূপ ক্ষেত্রে তার জবাব এভাবে দেবেন :

আল্লাহ তাঁর কিতাবে উল্লেখ করেছেন : 'যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে তারা মুহ্‌কামাত (অদ্ব্যর্থ) আয়াতগুলো বর্জন করে থাকে আর মুতাশাবিহাত (দ্ব্যর্থবোধক) আয়াতের পেছনে ধাবিত হয়।'

আমি আগেই উল্লেখ করেছি যে, আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন : মুশরিকগণ আল্লাহকে রব হিসেবে স্বীকৃতি দিয়ে থাকে, তবুও আল্লাহ তাদেরকে কাফিররূপে অভিহিত করেছেন এ জন্যই যে, তারা ফেরেশতা, নবী ও ওলীদের সঙ্গে ভ্রান্ত সম্পর্ক স্থাপন করে বলে থাকে :

هَـؤُلاَءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللّٰهِ(يونس : 18)

'আর তারা বলে, ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশকারী।'
(সুরা-ইউনুস : ১৮)

এটা একটি মুহকাম আয়াত যার অর্থ পরিষ্কার। এর অর্থ বিকৃত করার সাধ্য কারোরই নেই।

আর হে মুশরিক! তুমি আল-কুরআন অথবা নবী (সা.)-এর বাণী থেকে যা আমার নিকট পেশ করলে তার অর্থ আমি বুঝি না, তবে আমি দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, আল্লাহর কালামের মধ্যে কোন পরস্পর-বিরোধী কথা নেই, আর আল্লাহর নবী (সা.)-এর কোন কথাও আল্লাহর কালামের বিরোধী হতে পারে না।

এই জবাবটি অতি উত্তম ও সর্বোতভাবে সঠিক। কিন্তু আল্লাহ যাকে বুঝার ক্ষমতা দেন সে ছাড়া আর কেউ এ কথা উপলব্ধি করতে সক্ষম নয়। এই জবাবটি আপনি তুচ্ছ মনে করবেন না, দেখুন আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন :

وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ (حم السجدة: 35)

'এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা ধৈর্যশীল, এ গুণ কেবল তারাই লাভ করে যারা মহা ভাগ্যবান।' (সুরা-আস সিজদা : ৩৫)

২. **বিস্তারিত জবাব :** সত্য দ্বীন থেকে মানুষকে দূরে হটিয়ে রাখার জন্য আল্লাহর দুশমনগণ নবী রসুলদের প্রচারিত শিক্ষার বিরুদ্ধে যেসব ওজর আপত্তি ও বক্তব্য পেশ করে থাকে তার মধ্যে একটি এই যে—তারা বলে থাকে : 'আমরা আল্লাহর সঙ্গে কাউকে শরিক করি না বরং আমরা সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, কেউই সৃষ্টি করতে, রিযিক দিতে, উপকার এবং অপকার সাধন করতে পারে না একমাত্র একক এবং লা-শরিক আল্লাহ ছাড়া-আর (আমরা এ সাক্ষ্যও দিয়ে থাকি যে,) স্বয়ং মুহাম্মদ (সা.) ও নিজের কোন কল্যাণ এবং অকল্যাণ সাধন করতে সক্ষম নন। আব্দুল কাদের জিলানী ও অন্যান্যরা তো বহুদূরের কথা। কিন্তু একটি কথা এই যে, আমি একজন গুনাহগার ব্যক্তি, আর যারা আল্লাহর নেক বান্দা তাদের রয়েছে আল্লাহর নিকট বিশেষ মর্যাদা, তাই তাঁদের মধ্যস্থতায় আমি আল্লাহর নিকট তাঁর করুণা প্রার্থী হয়ে থাকি।'

এর উত্তর আগেই দেওয়া হয়েছে, আর তা হচ্ছে : যাদের সাথে রসুলুল্লাহ (সা.) যুদ্ধ করেছেন তারাও তুমি যে কথার উল্লেখ করলে তা স্বীকার করতো, আর এ কথাও তারা স্বীকার করতো যে, প্রতিমাগুলো কোন কিছুই পরিচালনা করে না। তারা প্রতিমাগুলোর নিকট পার্থিব মর্যাদা ও আখিরাতের মর্যাদার জন্য শাফায়াত কামনা করতো। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাঁর কিতাবে যা উল্লেখ করেছেন এবং বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন সে সব তাদের পড়ে শুনিয়ে দিন। এখানে সন্দেহকারী যদি (এই কুট তর্কের অবতারণা করে) বলে যে, এসব আয়াত মূর্তি-পূজকদের সম্বন্ধে অবতীর্ণ হয়েছে, তবে আপনারা কীভাবে নেক ব্যক্তিদেরকে প্রতিমাদের সমতুল্য করে নিচ্ছেন অথবা নবীগণকে কীভাবে প্রতিমার শামিল করছেন?

এর জবাব ঠিক আগের মতই। কেননা, যখন সে স্বীকার করছে যে, কাফিরগণও আল্লাহর সার্বভৌম রুবুবিয়াতের সাক্ষ্য দান করে থাকে আর তারা যাদেরকে উদ্দেশ্য করে নজর নিয়াজ প্রভৃতি পেশ অথবা পূজা অর্চনা করে থাকে তাদের থেকে মাত্র সুপারিশই কামনা করে; কিন্তু যদি তারা মূর্তি-পূজকদের কাজ–যা ইতোপূর্বে উল্লিখিত হয়েছে এবং তাদের কাজের মধ্যে পার্থক্য করার চেষ্টা করে, তা হলে তাদেরকে বলে দিন : কাফিরগণের মধ্যে কেউ তো প্রতিমা পূজা করে, আবার কেউ ওইসব আউলিয়াদের আহ্বান করে যাদের সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন :

أُولَـئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا (الاسراء : 57)

'তারা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তো তাদের প্রতিপালকের নিকট পৌছার পথ অনুসন্ধান করে যে, কে তাঁর অধিক নিকটবর্তী হতে পারবে, আর তাঁর দয়া প্রত্যাশা করে এবং তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। তোমার প্রতিপালকের শাস্তি তো ভয় করার মতোই।' (সুরা-আল-ইসরা : ৫৭)

এবং অন্যরা মারইয়াম তনয় ঈসা (আ.) ও তাঁর মাকে আহ্বান করে অথচ মহান আল্লাহ বলেছেন :

مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ كَانَا يَأْكُلاَنِ الطَّعَامَ انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّى يُؤْفَكُونَ - قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلاَ نَفْعًا وَاللّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (المائدة : 75-76)

'মারইয়াম পুত্র ঈসা রসুল ছাড়া কিছুই ছিল না। তার পূর্বে আরো রসুল অতীত হয়ে গেছে, তার মা ছিল সত্যপন্থী মহিলা, তারা উভয়েই খাবার খেত; লক্ষ্য কর তাদের কাছে সত্যের নিদর্শনসমূহ কেমন সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছি আর এটাও লক্ষ্য কর যে, কিভাবে তারা সত্য হতে বিপরীত দিকে চলে যাচ্ছে। বল, তোমরা আল্লাহ্কে বাদ দিয়ে কি এমন কিছুর ইবাদাত কর

যাদের না আছে কোন ক্ষতি করার ক্ষমতা, আর না আছে উপকার করার। আর আল্লাহ তিনি হলেন সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ৭৫-৭৬)

উল্লেখিত হঠকারীদের নিকটে আল্লাহ তাআ'লার একথাও উল্লেখ করুন :

وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ إِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُون - قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنتَ وَلِيُّنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُم بِهِم مُّؤْمِنُونَ

(سبا : 40-41)

'যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফেরেশতাদেরকে বলবেন—ওরা কি একমাত্র তোমাদেরই ইবাদাত করত? ফেরেশতারা বলবে—পবিত্র মহান তুমি, তুমিই আমাদের অভিভাবক, তারা নয়। বরং তারা জ্বীনদের পূজা করতো; ওদের অধিকাংশই ওদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল।'

(সুরা-সাবা : ৪০-৪১)

আরও উল্লেখ করুন :

وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَـهَيْنِ مِن دُونِ اللهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلاَ أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْغُيُوبِ

(المائدة : 116)

'স্মরণ কর, যখন আল্লাহ ঈসা ইবনু মারইয়ামকে বললেন, তুমি কি লোকেদেরকে বলেছিলে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে আর আমার মাকে ইলাহ বানিয়ে নাও। (উত্তরে) সে বলেছিল, পবিত্র মহান তুমি, এমন কথা বলা আমার শোভা পায় না যে কথা বলার কোন অধিকার আমার নেই, আমি যদি তা বলতাম, সেটা তো তুমি জানতেই; আমার অন্তরে কী আছে তা তুমি জান কিন্তু তোমার অন্তরে কী আছে তা আমি জানি না, তুমি অবশ্যই যাবতীয় গোপনীয় তত্ত্ব সম্পর্কে পূর্ণরূপে ওয়াকেফহাল।' (সুরা-আল-মায়িদাহ : ১১৬)

তারপর তাকে বলুন : তুমি কি (এখন) বুঝতে পারলে যে, আল্লাহ প্রতিমা-পূজকদের যেমন কাফির বলেছেন, তেমনই যারা নেক লোকদের শরণাপন্ন হয় তাদেরকেও কাফির বলেছেন এবং রসুলুল্লাহ (সা.) তাদের সঙ্গে জিহাদও

করেছেন। যদি সে বলে : কাফিরগণ (আল্লাহ ছাড়া) তাদের নিকট কামনা করে থাকে আর আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ মঙ্গল অমঙ্গলের মালিক ও সৃষ্টির পরিচালক, আমি তো তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর নিকট কিছুই কামনা করি না। আর নেক লোকদের এসব বিষয়ে কিছুই করার নেই, তবে তাদের শরণাপন্ন হই এ জন্য যে, তারা আল্লাহর নিকটে আমাদের জন্য সুপারিশ করবে। এর জবাব হচ্ছে **'এ তো কাফিরদের কথার হুবহু প্রতিধ্বনি মাত্র।'** আপনি তাকে আল্লাহর এই কালাম শুনিয়ে দিন :

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى (الزمر: 3)

'জেনে রেখো, খালেস দ্বীন কেবল আল্লাহ্‌রই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে–আমরা তাদের ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহ্‌র নৈকট্যে পৌঁছে দিবে।' (সুরা-আয্‌-যুমার : ৩)

তাকে আল্লাহর এ কালামও শুনিয়ে দিন :

وَيَقُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ(يونس : 18)

'আর তারা বলে, ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র কাছে সুপারিশকারী।'

(সুরা-ইউনুস : ১৮)

অষ্টম অধ্যায়
দোয়া ইবাদাতের সারাংশ

যারা মনে করে যে, দোয়া 'ইবাদাহ্ নয় তাদের প্রতিবাদ।

আপনি জেনে রাখুন যে, এই যে তিনটি সন্দেহ সংশয়ের কথা বলা হলো এগুলো তাদের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ তাআ'লা তাঁর কিতাবে আমাদের জন্য এ সব বিষয় বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, আর তা আপনি উত্তমরূপে বুঝে নিয়েছেন, অতএব এর পর অন্য সব সংশয় সন্দেহের অপনোদন মোটেই কঠিন হবে না।

যদি সে বলে, আমি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করি না আর সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের নিকট বিপদে আশ্রয় প্রার্থনা ও তাদের নিকট আহ্বান তাদের ইবাদাহ্ নয়। তবে আপনি তাকে বলুন : তুমি কি স্বীকার কর যে, আল্লাহর ইবাদাতকে একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস বা বিশুদ্ধ করা তোমার উপর ফরয করেছেন আর এটা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক্ব? যখন সে বলবে হ্যাঁ, আমি তা স্বীকার করি, তখন তাকে বলুন : এখন আমাকে বুঝিয়ে দাও, কি সেই ইবাদাহ্ যা একমাত্র তাঁরই জন্য খালেস করা তোমার উপর তিনি ফরয করেছেন এবং তা তোমার উপর তাঁর প্রাপ্য হক্ব। ইবাদাহ্ কাকে বলে এবং তা কত প্রকার? তা যদি সে না জানে তবে এ সম্পর্কে তার নিকটে আল্লাহর এই বাণী বর্ণনা করে দিন :

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (الاعراف : 55)

'তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহ্বান কর, তিনি সীমালঙ্ঘন-কারীদেরকে পছন্দ করেন না।' (সুরা-আল-আ'রাফ : ৫৫)

এটা তাকে বুঝিয়ে দেওয়ার পর তাকে জিজ্ঞেস করুন : দোয়া করা যে ইবাদাহ্ সেটা কি এখন বুঝলে? সে অবশ্যই বলবে : হ্যাঁ, কেননা সহীহ হাদিসেও বর্ণিত আছে : 'দোয়া ইবাদাতের সার বস্তু।' তখন আপনি তাকে বলুন : যখন তুমি স্বীকার করে নিলে যে দোয়াটা হচ্ছে ইবাদাহ্, আর তুমি

আল্লাহকে দিবানিশি ডাকছো যখন তুমি কোন নবীকে অথবা অন্য কাউকে ডাকছো ওই একই প্রয়োজন মিটানোর জন্য, তখন কি তুমি আল্লাহর ইবাদাতে অন্যকে শরিক করছো না? সে তখন অবশ্যই বলতে বাধ্য হবে, হ্যাঁ, শরিক করছি বটে। তখন তাকে শুনিয়ে দিন আল্লাহর এই বাণী :

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ (الكوثر: 2)

'কাজেই তুমি তোমার প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর।' (সুরা-আল-কাওসার : ২)

এই আয়াতের উপর আমল করে আল্লাহর জন্য তুমি যখন কুরবানি করছো তখন সেটা কি ইবাদাহ্ নয়? এর জবাবে সে অবশ্য বলবে : হ্যাঁ, তা ইবাদাহ্। এবার তাকে বলুন : তুমি যদি কোন সৃষ্টির জন্য যেমন নবী, জ্বীন বা অন্য কিছুর জন্য কুরবানি করো তবে কি তুমি এই ইবাদাতে আল্লাহর সঙ্গে অন্যকে শরিক করলে না? সে অবশ্যই একথা স্বীকার করতে বাধ্য হবে এবং বলবে : হ্যাঁ।

তাকে আপনি একথাও বলুন : যে মুশরিক্দের সম্বন্ধে আল-কুরআন (এর নির্দিষ্ট আয়াত) অবতীর্ণ হয়েছে তারা কি ফেরেশতা, (অতীতের) ওলী ও লাত উয্যা প্রভৃতির ইবাদাহ্ করতো? সে অবশ্য বলবে : হ্যাঁ, করতো। তারপর তাকে বলুন : তারা ইবাদাহ্ বলতে তো দেব-দেবীর প্রতি আহ্বান করা, পশু যবেহ্ করা ও আবেদন নিবেদন ইত্যাদিই বুঝতো বরং তারা তো নিজেদেরকে আল্লাহরই বান্দা ও তাঁরই আয়ত্তাধীন বলে স্বীকৃতি দিতো। আর একথাও স্বীকার করতো যে, আল্লাহই সকল বিষয়ের পরিচালক। কিন্তু আল্লাহর নিকট নেক ওলীদের যে মর্যাদা রয়েছে সে জন্যই তারা ওলীদেরকে আহ্বান করতো বা তাদের নিকট আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন করতো সুপারিশের উদ্দেশ্যে। এ বিষয়টি অত্যন্ত সুস্পষ্ট।

নবম অধ্যায়

শরীয়াত সম্মত শাফায়াত এবং শিরকী শাফায়াতের মধ্যে পার্থক্য

যদি সে বলে আপনি কি নবী করিম (সা.)-এর শাফায়াতকে অস্বীকার করছেন ও তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্ত মনে করছেন? আপনি তাকে উত্তরে বলবেন : না, অস্বীকার করি না। তাঁর থেকে নিজেকে নির্লিপ্তও মনে করি না। বরং তিনিই তো সুপারিশকারী যার শাফায়াত কবুল করা হবে। আমিও তাঁর শাফায়াতের আকাঙ্ক্ষী। কিন্তু শাফায়াতের যাবতীয় চাবি-কাঠি আল্লাহরই হাতে। আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا (الزمر : 44)

'বল– শাফায়াত সম্পূর্ণ আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারভুক্ত।' (সুরা-আয্‌-যুমার : ৪৪)

এছাড়া আল্লাহ বলেছেন : مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ (البقرة : 255)

'কে সেই ব্যক্তি যে তাঁর অনুমতি ছাড়া তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে?' (আল-বাকারা : ২৫৫)

এবং কারো সম্বন্ধেই রসুলুল্লাহ (সা.) সুপারিশ করবেন না যতক্ষণ পর্যন্ত না তার সম্বন্ধে আল্লাহ সুপারিশের অনুমতি দেবেন। যেমন আল্লাহ বলেছেন :

وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى (الأنبياء : 28)

'তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপারে ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করে না।' (সুরা-আল-আম্বিয়া : ২৮)

আর (একথা মনে রাখা কর্তব্য যে), আল্লাহ তাআ'লা তাওহীদ– অর্থাৎ খাঁটি ও নির্ভেজাল ইসলাম ছাড়া কিছুতেই রাজি হবেন না। যেমন তিনি বলেছেন :

وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ (آل عمران : 85)

'আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবুল করা হবে না।' (সুরা-আ'লি-ইমরান : ৮৫)

বস্তুতপক্ষে যখন সমস্ত সুপারিশ আল্লাহর অধিকারভুক্ত এবং তা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষ, আর নবী করিম (সা.) বা অন্য কেউ আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে সক্ষম হবেন না, আর আল্লাহর অনুমতি একমাত্র মুওয়াহহিদ (তাওহীদবাদীদের) জন্যই নির্দিষ্ট, তখন তোমার নিকট একথা

পরিষ্কার হয়ে গেল যে, সকল প্রকারের শাফায়াতের একমাত্র মালিক হচ্ছেন আল্লাহ। সুতরাং তুমি সুপারিশ তাঁরই নিকট কামনা করো এবং বলো : 'হে আল্লাহ! আমাকে রসুল (সা.)-এর সুপারিশ হতে বঞ্চিত করো না। হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে আমার জন্য সুপারিশকারী করে দাও। অনুরূপভাবে অন্যান্য দোয়া ও আল্লাহর নিকটেই করতে হবে। যদি সে বলে, নবী করিম (সা.)-কে শাফায়াতের অধিকার দেওয়া হয়েছে কাজেই আমি তাঁর নিকটেই সে বস্তু চাচ্ছি যা আল্লাহ তাঁকে দান করেছেন। তার উত্তর হচ্ছে : আল্লাহ তাঁকে শাফায়াত করার অধিকার প্রদান করেছেন এবং তিনি তোমাকে তাঁর নিকটে শাফায়াত চাইতে নিষেধ করেছেন। আল্লাহ বলেছেন :

فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا (الجن : 18)

'অতএব (তোমরা আহ্বান করতে থাকবে একমাত্র আল্লাহকে এবং) আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না।' (সুরা-আল-জ্বীন : ১৮)

যখন তুমি আল্লাহকে এই বলে ডাকবে যে, তিনি যেন তাঁর নবীকে তোমার জন্য সুপারিশকারী করে দেন, তখন তুমি আল্লাহর এই আয়াতের আনুগত্য করলে : فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللّٰهِ أَحَدًا (الجن : 18)

'আল্লাহর সঙ্গে আর কাউকেই ডাকবে না।' (সুরা-আল-জ্বীন : ১৮)

আরও একটি কথা হচ্ছে যে, সুপারিশের অধিকার নবী ব্যতীত অন্যদেরও দেওয়া হয়েছে। যেমন–ফেরেশতারা সুপারিশ করবেন, ওলীগনও সুপারিশ করবেন। মাসুম বাচ্চারাও (তাদের পিতামাতাদের জন্য) সুপারিশ করবে। কাজেই তুমি কি সেই অবস্থায় বলতে পারবে যে, 'যেহেতু আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার দিয়েছেন, কাজেই তাদের কাছেও আমরা শাফায়াত চাইবো? যদি তা চাও তবে তুমি তাদের ইবাদাতে শামিল হলে। যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে (হারাম বা অবৈধ বলে) উল্লেখ করেছেন। সে যদি বলে : না, তাদের কাছে সুপারিশ চাওয়া যাবে না, তবে সেই অবস্থায় তার এই কথা স্বতঃসিদ্ধভাবে বাতিল হয়ে যাচ্ছে যে, আল্লাহ তাদেরকে সুপারিশের অধিকার প্রদান করেছেন এবং আমি তার নিকট সেই বস্তুই চাচ্ছি যা তিনি তাকে দান করেছেন।'

দশম অধ্যায়

নেক লোকদের নিকট বিপদ-আপদে আশ্রয় প্রার্থনা করা শিরক্

এ কথা সাব্যস্ত করা যে, নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা অথবা নিবেদন পেশ করা শিরক্ এবং যারা একথা অস্বীকার করে তাদেরকে স্বীকৃতির দিকে আহ্বান করা।

যদি সে বলে : আমি আল্লাহর সঙ্গে কোন বস্তুকেই শরিক করি না- কিছুতেই নয়, কখনও নয়। তবে নেক লোকদের নিকট বিপদে আপদে আশ্রয় প্রার্থনা বা আবেদন নিবেদন জ্ঞাপন করে থাকি, আর এটা শিরক্ নয়।

এর জবাবে তাকে বলুন : যখন তুমি স্বীকার করে নিয়েছো যে, আল্লাহ তাআ'লা ব্যভিচার থেকেও শিরককে কঠিনভাবে হারাম করেছেন আর এ কথাও মেনে নিয়েছো যে, আল্লাহ তাআ'লা শিরক এর পাপ ক্ষমা করবেন না তাহলে ভেবে দেখ, সেটা কীরূপ ভয়ংকর বস্তু (শিরক্) যা তিনি হারাম করেছেন এবং বলে দিয়েছেন যে, তিনি তা ক্ষমা করবেন না।

কিন্তু এ বিষয়ে সে কিছুই জানে না- সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

তাকে আপনি বলুন : তুমি কীভাবে শিরক্ থেকে আত্মরক্ষা করবে যখন তুমি একথা জানলে না যে, শিরক্ কি জঘন্য পাপ অথবা একথাও জানলে না যে, কেন আল্লাহ তোমার উপর শিরক্ হারাম করেছেন আর বলে দিয়েছেন যে : তিনি ওই পাপ মাফ করবেন না। আর তুমি এ বিষয়ে কিছুই জান না অথচ তুমি এ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞাসাও করছো না। তুমি কি ধারণা করে বসে আছো যে, আল্লাহ এটাকে হারাম করেছেন আর তিনি তার (কারণগুলি) বিশ্লেষণ করেন নি?

যদি সে বলে : শিরক্ হচ্ছে মূর্তি-পূজা আর আমরা তো মূর্তি পূজা করছি না। তবে তাকে বলুন : মূর্তি-পূজা কাকে বলে? তুমি কি মনে কর যে, মুশরিক্গণ এই বিশ্বাস পোষণ করে যে এসব কাঠ ও পাথর (নির্মিত মূর্তিগুলো) সৃষ্টি ও রিযিক দান করতে সক্ষম এবং যারা তাদেরকে আহ্বান

করে তাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের কাজের সুব্যবস্থা করে দিতেও সামর্থ্য রাখে? একথা তো আল-কুরআন মিথ্যা বলে ঘোষণা করেছে।

যদি সে বলে, শিরক্ হচ্ছে যারা কাঠ ও পাথর নির্মিত মূর্তি বা কবরের দিকে লক্ষ্য করে নিজেদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য এদের প্রতি আহ্বান জানায়, এদের উদ্দেশ্যে কুরবানী করে আর এদের বরকতে আল্লাহ বিপদ-আপদ দূর করবেন বা আল্লাহ এদের বরকতে অনুগ্রহ করবেন বলে বিশ্বাস করে। তবে তাকে বলুন : হ্যাঁ, তুমি সত্য কথাই বলেছো আর এটাই তো তোমাদের কর্মকাণ্ড যা পাথর, কবর প্রভৃতির নিকটে করে থাকো। ফলতঃ সে স্বীকার করছে যে, তাদের এই কাজগুলো হচ্ছে মূর্তি-পূজা, আর এটাই তো আমরা চাই। অর্থাৎ তোমরা নিজেরাই তোমাদের কথায় আমাদের বক্তব্য প্রকারান্তরে মেনে নিলে।

যখন সে বলবে, আমি আল্লাহর সঙ্গে (কাউকে) শরিক করি না, তখন আপনি তাকে বলুন : আল্লাহর সঙ্গে শিরক্ এর অর্থ কি? তুমি তার ব্যাখ্যা দাও। যদি সে এর ব্যাখ্যায় বলে : তা হচ্ছে মূর্তি-পূজা, তখন আপনি তাকে আবার প্রশ্ন করেন : মূর্তি-পূজার মানে কি? তুমি আমাকে তার ব্যাখ্যা প্রদান করো। যদি সে উত্তরে বলে : আমি এক আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও ইবাদাহ্ করি না, তখন তাকে আবার প্রশ্ন করেন : এককভাবে আল্লাহর ইবাদাতেরই বা অর্থ কি? এর ব্যাখ্যা দাও। উত্তরে যদি সে কুরআন যে ব্যাখ্যা প্রদান করেছে সেই ব্যাখ্যাই দেয় তবে তো আমাদের দাবিই সাব্যস্ত হল আর এটাই আমাদের উদ্দেশ্য। আর যদি সে আল-কুরআনের সেই ব্যাখ্যাটা না জানে, তবে সে কেমন করে এমন বস্তুর দাবি করেছে যা সে জানে না? আর যদি সে তার এমন ব্যাখ্যা প্রদান করে যা তার প্রকৃত অর্থ নয়, তখন তাকে আল্লাহর সাথে শিরক্ ও মূর্তিপূজা সংক্রান্ত আয়াত শুনিয়ে দিন আর (বুঝিয়ে দিন) ওই কাজটিই তো হুবহু করে চলেছে এ যুগের মুশরিক্গণ! আর আল্লাহর শিরকমুক্ত ইবাদাতকে অস্বীকার করে আসছে আর এ নিয়ে তাদের পুর্বসূরিদের ন্যায় তারা শোরগোল করছে। তাদের পূর্বসূরিরা বলতো :

أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ (ص : 5)

‘এই লোকটা কি বহু ইলাহকে এক ইলাহ-তে পরিণত করছে? এটা তো বস্তুতই একটা তাজ্জব ব্যাপার।’ (সুরা-সা’দ : ৫)

সে যদি বলে ফেরেশতা ও আম্বিয়াদের ডাকার কারণে তাদেরকে তো কাফির বলা হয়নি। ফেরেশতাদেরকে যারা আল্লাহর কন্যা বলেছিল তাদেরকে কাফির বলা হয়েছে। আমরা তো আবদুল কাদের বা অন্যদেরকে আল্লাহর পুত্র বলি না।

তার উত্তর হচ্ছে এই যে, সন্তানকে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কিত করাটাই স্বয়ং কুফরি।

আল্লাহ তাআ’লা বলেছেন :

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - اللَّهُ الصَّمَدُ (الاخلاص : 1-2)

‘বল, তিনি আল্লাহ, এক অদ্বিতীয়, আল্লাহ কোন কিছুর মুখাপেক্ষী নন, সবই তাঁর মুখাপেক্ষী।’ (সুরা-আল-ইখলাস : ১-২)

‘আহাদ’ এর অর্থ হলো একক এবং তাঁর সমতুল্য কেউই নেই। আর ‘সামাদ’ এর অর্থ হচ্ছে প্রয়োজনে একমাত্র যার স্মরণ নেওয়া হয়। অতএব, যে এটাকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায়–যদিও সে আয়াতকে অস্বীকার করে না। আল্লাহ তাআ’লা বলছেন :

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَٰهٍ (المؤمنون : 91)

‘আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেন নি, আর তাঁর সাথে অন্য কোন ইলাহ নেই।’ (সুরা-আল-মু’মিনূন : ৯১)

উপরে কুফরির যে দুটি প্রকারের উল্লেখ করা হয়েছে তা আল্লাহ পৃথকভাবে উল্লেখ করলেও উভয়ই নিশ্চিত রূপে কুফর। আল্লাহ তাআ’লা বলছেন:

وَجَعَلُواْ لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُواْ لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ (الانعام : 100)

‘তারা জ্বীনকে আল্লাহর অংশীদার স্থির করে অথচ তাদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন, তারা না জেনে না বুঝে আল্লাহর জন্য পুত্র-কন্যা স্থির করে, তাদের এসব কথা হতে তিনি পবিত্র ও মহান।’ (সুরা-আল-আন’আম : ১০০)

এখানেও দুই প্রকারের কুফরিকে তিনি পৃথকভাবে উল্লেখ করেছেন। এর প্রমাণ এটাও হতে পারে যে, নিশ্চয় তারা কাফির হয়ে গিয়েছিল লাতকে আহ্বান করে যদিও লাত ছিল একজন সৎলোক। তারা তাকে আল্লাহর ছেলেও বলেনি। অপর পক্ষে যারা জ্বীনদের পূজা করে কাফির হয়েছে তারাও তাদেরকে আল্লাহর ছেলে বলেনি। এই রকম 'মুরতাদ' (যারা ঈমান আনার পর কাফির হয়ে যায়) সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে চার মাজহাবের আলেমগণ বলেছেন যে, কোন মুসলিম যদি ধারণা রাখে যে, আল্লাহর ছেলে রয়েছে তবে সে 'মুরতাদ' হয়ে গেল। তারাও উক্ত দুই প্রকারের কুফরির মধ্যে পার্থক্য করেছেন। এটা তো খুবই স্পষ্ট। যদি সে আল্লাহর এই কালাম পেশ করে :

اَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (يونس : 62)

'জেনে রেখ! আল্লাহ্‌র বন্ধুদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিতও হবে না।'
(সুরা–ইউনুস : ৬২)

তবে আপনি বলুন : হ্যাঁ, একথা তো অভ্রান্ত সত্য কিন্তু তাই বলে তাদের ইবাদাত করা চলবে না।

আর আমরা কেবল আল্লাহর সাথে অন্যকে শরীক করার কথাই অস্বীকার করছি। নতুবা আউলিয়াদের প্রতি ভালোবাসা রাখা ও তাদের অনুসরণ করা এবং তাদের কারাতমগুলোকে স্বীকার করা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য। আর আউলিয়াদের কারামতকে বিদ'আতী ও বাতিলপন্থীরা ছাড়া কেউ অস্বীকার করে না।

আল্লাহর দ্বীন দুই প্রান্ত সীমার মধ্যস্থলে, সঠিক পথ দুই ভ্রান্তপথের মধ্যস্থলে আর হক্ব, দুই বাতিলের মধ্যস্থলে অবস্থিত।

একাদশ অধ্যায়

আমাদের যুগে লোকদের শিরক্ অপেক্ষা পূর্ববর্তী লোকদের শিরক্ ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা

আপনি যখন বুঝতে পারলেন যে, যে বিষয়টিকে আমাদের যুগের মুশরিক্গণ নাম দিয়েছে 'ইতেকাদ'-(ভক্তি মিশ্রিত বিশ্বাস) সেটাই হচ্ছে সেই শিরক্ যার বিরুদ্ধে আল-কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে এবং আল্লাহর রসুল (সা.) যার কারণে লোকদের বিরুদ্ধে জিহাদে অবতীর্ণ হয়েছেন। তখন আপনি জেনে রাখুন যে, পূর্ববর্তী লোকদের শিরক্ ছিল বর্তমান যুগের লোকদের শিরক্ এর তুলনায় হালকা। আর তার কারণ হচ্ছে দুটি :

এক. পূর্ববর্তী লোকগণ কেবল সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের সময়েই আল্লাহর সাথে অপরকে শরিক করতো এবং ফেরেশতা, আউলিয়া ও ঠাকুর-দেবতাদেরকে আহ্বান জানাতো, কিন্তু বিপদ আপদের সময় একমাত্র আল্লাহকেই ডাকতো, সে দোয়া হতো সম্পূর্ণ নির্ভেজাল। যেমন আল্লাহ কুরআনে বলেছেন :

وَإِذَا مَسَّكُمُ الْضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلاَّ إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الإِنْسَانُ كَفُورًا (الاسراء : 67)

'সমুদ্রে যখন বিপদ তোমাদেরকে পেয়ে বসে, তখন তাঁকে ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা (উপাস্য ভেবে) আহ্বান কর তারা (তখন তোমাদের মন থেকে) হারিয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে এনে বাঁচিয়ে দেন, তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।' (সুরা-আল-ইসরা : ৬৭)

আল্লাহ এ কথাও বলেছেন :

قُلْ أَرَأَيْتُكُم إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللهِ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ - بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاء وَتَنسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ (الانعام : 40-41)

'বল, তোমরা কি ভেবে দেখেছ, তোমাদের উপর যদি আল্লাহর শাস্তি এসে পড়ে কিংবা তোমাদের উপর কিয়ামত এসে যায় তাহলে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ডাকবে? (বল না) তোমরা যদি সত্যবাদী হও। বরং (এমন অবস্থায়) তোমরা একমাত্র তাঁকেই ডেকে থাক, অতঃপর ইচ্ছে করলে তিনি তা দূর করে দেন যার জন্য তোমরা তাঁকে ডাক আর তোমরা যাদেরকে তাঁর অংশীদার বানাও তাদের কথা ভুলে যাও।' (সুরা-আল-আন'আম : ৪০-৪১)

আল্লাহ তাআ'লা একথাও বলেছেন :

وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلَّ عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ (الزمر : ٨)

'দুঃখ-মুসিবত যখন মানুষকে স্পর্শ করে তখন সে তার প্রতিপালককে ডাকতে থাকে তাঁর প্রতি বড়ই একনিষ্ঠ হয়ে। অতঃপর তিনি যখন নিজ পক্ষ থেকে অনুগ্রহ দিয়ে তাকে ধন্য করেন, তখন পূর্বে সে যেজন্য তাঁকে ডেকেছিল তা ভুলে যায় এবং অন্যদেরকে আল্লাহ্‌র সমকক্ষ দাঁড় করায় তাঁর পথ থেকে গুমরাহ করার জন্য। বলে দাও, কুফুরীর জীবন একটু ভোগ করে নাও, (অতঃপর) তুমি তো হবে জাহান্নামের অধিবাসী। (এ ব্যক্তি ভাল, না ঐ ব্যক্তি)' (সুরা-আযযুমার : ৮)

অতঃপর আল্লাহর এই বাণী :

وَإِذَا غَشِيَهُم مَّوْجٌ كَالظُّلَلِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (لقمان : 32)

'ঢেউ যখন তাদেরকে (মেঘের) ছায়ার মত ঢেকে নেয়, তখন তারা আল্লাহকে ডাকতে থাকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ আনুগত্যে।' (সুরা-লুকমান : ৩২)

যে ব্যক্তি এই বিষয়টি বুঝতে সক্ষম হলো যা আল্লাহ তাঁর কিতাবে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন–যার মূলকথা হচ্ছে এই, যে সকল মুশরিক্‌দের বিরুদ্ধে রসুল (সা.) যুদ্ধ করেছিলেন তারা তাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও নিরাপত্তার সময়ে আল্লাহকেও ডাকতো আবার আল্লাহ্ ছাড়া অন্যকেও ডাকতো, কিন্তু বিপদ-

বিপর্যয়ের সময় তারা একক ও লা-শরিক আল্লাহ ছাড়া অপর কাউকেই ডাকতো না, তারা বরং সে সময় অন্য সব মাননীয় ব্যক্তি ও পূজনীয় সত্ত্বাদের ভুলে যেতো। তার নিকট আপনি পূর্ববর্তী যুগের লোকদের শিরক্ এবং আমাদের বর্তমান যুগের লোকদের শিরক্ এর পার্থক্যটা স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এমন লোক কোথায় পাওয়া যাবে যার হৃদয় এই বিষয়টি উত্তমরূপে ও গভীরভাবে উপলব্ধি করবে? একমাত্র আল্লাহই আমাদের সহায়।

দুই. পূর্ববর্তী যুগের লোকগণ আল্লাহর সাথে এমন ব্যক্তিদের কাছে দোয়া করতো যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত, তারা হতেন হয় নবী-রসুলগণ অথবা ওলী-আউলিয়া নতুবা ফেরেশতাগণ! এছাড়া তারা হয়তো ইবাদাত করতো এমন বৃক্ষ অথবা পাথরের যারা আল্লাহর একান্ত বাধ্য ও অনুগত, কোনক্রমেই তারা অবাধ্য নয়, হুকুম অমান্যকারী নয়।

কিন্তু আমাদের এই যুগের লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে এমন লোকদের কাছে দোয়া করে যারা নিকৃষ্টতম অনাচারী, আর যারা তাদের নিকট ধরনা দেয় ও প্রার্থনা জানায় তারাই তাদের অনাচারগুলোর কথা ফাঁস করে দেয়, সে অনাচারগুলোর মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি এবং সালাত পরিত্যাগের মত গর্হিত কাজসমূহ।

অতএব যারা নেক লোকদের প্রতি আস্থা রেখে তাদের ইবাদাত করে বা এমন বস্তুর ইবাদাত করে যেগুলো কোন পাপ করে না, (যেমন : গাছ, পাথর ইত্যাদি) তারা ওই সব লোকদের থেকে নিশ্চয় লঘুতর পাপী যারা ওই লোকদের ইবাদাত করে যাদের অনাচার ও পাপাচারগুলোকে তারা নিজে দেখে থাকে এবং তার সাক্ষ্যও প্রদান করে থাকে।

দ্বাদশ অধ্যায়
ফরজ-ওয়াজিব পালনকারী ব্যক্তিও কাফির হতে পারে

'যে ব্যক্তি দ্বীন এর কতিপয় ফরয ওয়াজিব অর্থাৎ অবশ্যকরণীয় কর্তব্য পালন করে, সে তাওহীদ বিরোধী কাজ করলেও কাফির হয় না'—যারা এই ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে, তাদের ভ্রান্তির নিরসন এবং তার বিস্তারিত প্রমাণপঞ্জি।

উপরের আলোচনায় একথা সাব্যস্ত হয়ে গেল যে, যাদের বিরুদ্ধে রসুলুল্লাহ (সা.) জিহাদ করেছেন তারা এদের (আজকের দিনে শিরক্ এ লিপ্ত-নামধারী মুসলিমদের) চাইতে ঢের বেশি বুদ্ধিমান ছিল এবং তাদের শিরক্ অপেক্ষাকৃত লঘু ছিল। অতঃপর একথাও আপনি জেনে রাখুন যে, এদের মনে আমাদের বক্তব্যের ব্যাপারে যে ভ্রান্তি ও সন্দেহ-সংশয় রয়েছে সেটাই তাদের সব চাইতে বড় ও গুরুতর ভ্রান্তি। অতএব এই ভ্রান্তি ও সন্দেহ নিরসনে নীচের কথাগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনুন :

তারা বলে থাকে : যাদের প্রতি সাক্ষাৎ ভাবে আল-কুরআন নাযিল হয়েছিল (অর্থাৎ মক্কার কাফির-মুশরিক্‌গণ) তারা আল্লাহ ছাড়া কোনই মা'বুদ নেই একথার সাক্ষ্য প্রদান করে নি, তার রসুল (সা.)-কে মিথ্যা বলেছিল, তারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করেছিল, তারা আল-কুরআনকে মিথ্যা বলেছিল এবং বলেছিল এটাও একটি জাদু মন্ত্র। কিন্তু আমরা তো সাক্ষ্য দিয়ে থাকি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং (এ সাক্ষ্যও দেই যে) নিশ্চয় মুহাম্মদ (সা.) তাঁর রসুল, আমরা আল-কুরআনকে সত্য বলে জানি ও মানি আর আখিরাত এর বিশ্বাস রাখি, আমরা সালাত আদায় করি এবং সিয়াম পালন করি, তবু আমাদেরকে এদের (উক্ত বিষয়ে অবিশ্বাসী কাফিরদের) মত মনে করেন কেন?

এর জবাব হচ্ছে এই যে, এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ একমত যে, একজন লোক যদি কোন কোন ব্যাপারে রসুলুল্লাহ (সা.)-কে সত্য বলে মানে আর কোন কোন বিষয়ে তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে ভাবে, তবে সে নির্ঘাত কাফির, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারে না; এই একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও যে ব্যক্তি আল-কুরআন এর কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কিছু অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু সালাত যে ফরয তা মেনে নিল না। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, সালাতও পড়ল কিন্তু জাকাত

যে ফরয তা মানল না; অথবা এগুলো সবই স্বীকার করলো কিন্তু সিয়ামকে অস্বীকার করলো কিংবা ওই গুলো সবই স্বীকার করলো কিন্তু একমাত্র হজ্বকে অস্বীকার করল, এরা সবাই হবে কাফির।

রসুলুল্লাহ (সা.)-এর যুগে কিছু লোক হজ্বকে অস্বীকার করেছিল, তাদেরকে লক্ষ্য করেই আল্লাহ আয়াত নাজিল করলেন :

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (آل عمران : 97)

'আল্লাহ্র জন্য উক্ত ঘরের হজ্ব করা লোকেদের উপর অবশ্য কর্তব্য যার সে পর্যন্ত পৌছার সামর্থ্য আছে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন।' (সুরা-আ'লি-ইমরান : ৯৭)

কোন ব্যক্তি যদি এগুলো সমস্তই (অর্থাৎ তাওহীদ, সালাত, জাকাত, সিয়াম, হজ্ব) মেনে নেয় কিন্তু পুনরুত্থানের কথা অস্বীকার করে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হয়ে যাবে। তার রক্ত এবং তার ধন-দৌলত সব হালাল হবে (অর্থাৎ তাকে হত্যা করা এবং তার ধন-মাল নিয়ে নেওয়া সিদ্ধ হবে) যেমন আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُواْ بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُواْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً - أُوْلَـئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا (النساء : 150-151)

'যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলদেরকে অস্বীকার করে আর আল্লাহ ও রসুলদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করতে চায় আর বলে (রসুলদের) কতককে আমরা মানি আর কতককে মানি না, আর তারা তার (কুফর ও ঈমানের) মাঝ দিয়ে একটা রাস্তা বের করতে চায়। তারাই হল প্রকৃত কাফির আর কাফিরদের জন্য আমি অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি।' (সুরা-আন নিসা : ১৫০-১৫১)

আল্লাহ তাআ'লা যখন তাঁর কালাম পাকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছেন যে, যে ব্যক্তি দ্বীন এর কিছু অংশকে মানবে আর কিছু অংশকে অস্বীকার করবে, সে সত্যিকারের কাফির এবং তার প্রাপ্য হবে সেই বস্তু (শাস্তি) যা উপরে উল্লেখিত হয়েছে। এই আয়াতের মাধ্যমে এ সম্পর্কিত ভ্রান্তিও অপনোদন ঘটেছে।

আর তাকে এই কথাও বলা যাবে : তুমি যখন স্বীকার করছো যে, যে ব্যক্তি সমস্ত ব্যাপারে আল্লাহর রসুলকে সত্য জানবে, শুধুমাত্র সালাত ফরয হওয়াকে অস্বীকার করবে সে সর্বসম্মতিক্রমে কাফির হবে, আর তার জান-মাল হালাল হবে, ওই রূপ সব বিষয় মেনে নিয়ে যদি পরকালকে অস্বীকার করে তবুও কাফির হয়ে যাবে।

ওই রূপই সে কাফির হয়ে যাবে যদি ওই সমস্ত বস্তুর উপর ঈমান আনে আর কেবলমাত্র রমযানের সিয়ামকে অস্বীকার করে। এতে কোন মাজহাবেরই দ্বিমত নেই। আর আল-কুরআনও এ কথাই বলেছে, যেমন আমরা ইতোপূর্বে দেখিয়েছি। ইতোমধ্যে আমরা এটাও জেনেছি যে, নবী (সা.) যে সব ফরয কাজ নিয়ে এসেছিলেন তার মধ্যে তাওহীদ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় এবং তা সালাত, সিয়াম ও হজ্ব হতেও শ্রেষ্ঠতর।

যখন মানুষ নবী (সা.) কর্তৃক আনীত ফরয, ওয়াজিব সমূহের সবগুলোকে মেনে নিয়ে ওইগুলোর একটি মাত্র অস্বীকার করে কাফির হয়ে যায়, তখন কি করে সে কাফির না হয়ে পারে যদি সে সমস্ত দ্বীন-এর মূল বস্তু তাওহীদকেই অস্বীকার করে বসে? সুবহানাল্লাহ! কি বিস্ময়কর এই মূর্খতা!

তাকে এ কথাও বলা যায় যে, মহানবী (সা.)-এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন, অথচ তারা রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট ইসলাম গ্রহণ করেছিল। তারা সাক্ষ্য প্রদান করেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রসুল। এ ছাড়া তারা আযানও দিতো এবং সালাতও পড়তো।

সে যদি তাদের এই কথা পেশ করে যে, তারা তো মুসায়লামা (আল-কায্যাব)-কে একজন নবী বলে মেনেছিল।

তবে তার উত্তরে বলবেন : ওইটিই তো আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। কেননা যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে নবীর মর্যাদায় উন্নীত করে তবে সে কাফির হয়ে যায় এবং তার জান মাল হালাল হয়ে যায়, এই অবস্থায় তার দুটি সাক্ষ্য (প্রথম সাক্ষ্য : আল্লাহ ছাড়া নেই অপর কোন সত্য ইলাহ, দ্বিতীয় সাক্ষ্য : মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর বান্দা এবং রসুল) তার কোনই উপকার করে না, সালাতও

তার কোন উপকার করতে সক্ষম হয় না। অবস্থা যখন এই, তখন সেই ব্যক্তির পরিণাম কি হবে যে, শিমসান, ইউসুফ (অতীতে এদের উদ্দেশ্যে পূজা করা হতো) বা কোন সাহাবা বা নবীকে মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর সুউচ্চ মর্যাদায় সমাসীন করে? পাক পবিত্র তিনি, তাঁর মান-মর্যাদা সুউচ্চ।

كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ (روم: 59)

'যাদের জ্ঞান নেই এভাবেই আল্লাহ তাদের হৃদয় মোহরাঙ্কিত করে দেন।'

(সুরা-আর-রূম : ৫৯)

ইতিমধ্যে আমরা এটাও জেনেছি যে, প্রতিপক্ষকে এটাও বলা যাবে : হযরত আলী (রা.) যাদেরকে পুড়িয়ে হত্যা করেছিলেন তারা সকলেই ইসলামের দাবিদার ছিল এবং হযরত আলীর অনুগামী ছিল, অধিকন্তু তারা সাহাবাগণের নিকটে শিক্ষা লাভ করেছিল। কিন্তু তারা হযরত আলীর সম্বন্ধে ওই রূপ বিশ্বাস রাখতো যেমন ইউসুফ, শিসমান এবং তাদের মত আরও অনেকের সম্বন্ধে বিশ্বাস পোষণ করা হয়। (প্রশ্ন হচ্ছে) তাহলে কি করে সাহাবাগণ তাদেরকে (ওই ভাবে) হত্যা করার ব্যাপারে এবং তাদের কুফরির উপর একমত হলেন? তাহলে তোমরা কি ধারণা করে নিচ্ছ যে, সাহাবাগণ মুসলিমকে কাফির রূপে আখ্যায়িত করেছেন? নাকি তোমরা ধারণা করছো যে, (ইউসুফ, শিসমান) তাজ এবং অনুরূপ অন্যান্যের উপর বিশ্বাস রাখা ক্ষতিকর নয়, কেবল হযরত আলীর প্রতি ভ্রান্ত বিশ্বাস রাখাই কুফরি?

আর এ কথাও বলা যেতে পারে যে, যে বানু ওবায়দ আল কান্দাহ, বানু আব্বাসের শাসনকালে মরক্কো প্রভৃতি দেশে ও মিসরে রাজত্ব করেছিল, তারা সকলেই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' কালিমার সাক্ষ্য দিতো–ইসলামকেই তাদের ধর্ম বলে দাবি করতো। জুম'আহ ও জামাআতে সালাতও আদায় করতো। কিন্তু যখন তারা কোন কোন বিষয়ে শরীয়াতের বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধাচরণের কথা প্রকাশ করলো, তখন তাদেরকে কাফির আখ্যায়িত করা এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উপর আলেম সমাজ একমত হলেন। আর তাদের দেশকে দারুল হারব বা যুদ্ধের দেশ বলে ঘোষণা করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন। আর মুসলিমদের শহরগুলোর মধ্যে যেগুলো তাদের হস্তগত হয়েছিল তা পুনরুদ্ধার করে নিলেন।

তাকে আরও বলা যেতে পারে যে, পূর্বযুগের লোকদের মধ্যে যাদের কাফির বলা হতো তাদের এজন্যই তা বলা হতো যে, তারা আল্লাহর সাথে শিরক্ ছাড়াও রসুল (সা.) ও আল-কুরআনকে মিথ্যা জানতো এবং পুনরুত্থান প্রভৃতিকে অস্বীকার করতো। কিন্তু এটাই যদি প্রকৃত এবং একমাত্র কারণ হয় তাহলে 'বাবু হুকমিল মুরতাদ' বা 'মুরতাদের হুকুম' নামীয় অধ্যায় কি অর্থ বহন করবে যা সব মাজহাবের আলেমগণ বর্ণনা করেছেন? 'মুরতাদ হচ্ছে সেই মুসলিম, যে ইসলাম গ্রহণের পর কুফরিতে ফিরে যায়।'

তারপর তারা মুরতাদের বিভিন্ন প্রকরণের উল্লেখ করেছেন আর প্রত্যেক প্রকারের মুরতাদকে কাফির বলে নির্দেশিত করে তাদের জান এবং মাল হালাল বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এমন কি তারা কতিপয় লঘু অপরাধ যেমন : যে ব্যক্তি শুধু মুখ দিয়ে একটা অবাঞ্ছিত কথা বলে ফেলল অথবা ঠাট্টা মশকরার ছলে বা খেল-তামাশায় কোন অবাঞ্ছিত কথা উচ্চারণ করে ফেলল—এমন অপরাধীদেরও মুরতাদ বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাদের এ কথাও বলা যেতে পারে যে, এসব লোক সম্বন্ধে আল্লাহ বলেছেন :

يَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ مَا قَالُواْ وَلَقَدْ قَالُواْ كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُواْ بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ (التوبة : 74)

'তারা আল্লাহ্‌র নামে শপথ করে বলে যে তারা (অন্যায়) কিছু বলেনি, কিন্তু তারা তো কুফরী কথা বলেছে আর ইসলাম গ্রহণ করার পরও কুফরী করেছে।' (সুরা-আত্-তাওবাহ্ : ৭৪)

তুমি কি শুনোনি মাত্র একটি কথার জন্য আল্লাহ্ একদল লোককে কাফির বলেছেন, অথচ তারা ছিল রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সমসাময়িক কালের লোক এবং তারা তাঁর সঙ্গে জিহাদ করেছে, সালাত পড়েছে, যাকাত দিয়েছে, হজ্ব পালন করেছে এবং তাওহীদের উপর বিশ্বাস রেখেছে?

আল্লাহ বলেছেন :

قُلْ أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِؤُونَ - لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبة : 65-66)

'তাদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা জোর দিয়েই বলবে, আমরা হাস্য রস আর খেল-তামাশা করছিলাম। বল, আল্লাহ, তাঁর আয়াত ও তাঁর রসুলকে নিয়ে তোমরা বিদ্রূপ করছিলে? ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরী করেছো। তোমাদের মধ্যেকার কোন দলকে ক্ষমা করলেও অন্যদেরকে শাস্তি দেব, কারণ তারা অপরাধী।' (সুরা-আত্-তাওবাহ্ : ৬৫-৬৬)

এই লোকদের সম্বন্ধেই আল্লাহ স্পষ্টভাবে বলেছেন : তারা ঈমান আনার পর কাফির হয়েছে। অথচ তারা রসুলুল্লাহ (সা.) এর সঙ্গে তাবুকের যুদ্ধে যোগদান করেছিল। তারা তো মাত্র একটি কথাই বলেছিল এবং সেটা হাসি ও ঠাট্টার ছলে।

এখন আপনি এ সংশয় ও ধোঁকাগুলোর ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। সেটা হল : তারা বলে, আপনারা মুসলিমদের মধ্যে এমন লোককে কাফির বলছেন যারা আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিচ্ছে, তারা সালাত পড়ছে, সিয়াম পালন করছে। তারপর তাদের এ সংশয়ের জবাবও গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন। কেননা এই পুস্তকের বিভিন্ন আলোচনার মধ্যে এটাই উপকারজনক। এই বিষয়ের আর একটা প্রমাণ হচ্ছে আল-কুরআনে বর্ণিত সেই কাহিনী যা আল্লাহ তাআ'লা বনী ইসরাইলের সম্বন্ধে বলেছেন। তাদের ইসলাম, তাদের জ্ঞান এবং সত্যগ্রহন সত্ত্বেও তারা হযরত মূসা (আ.)-কে বলেছিল :

اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ (الاعراف : 138)

'আমাদের জন্যও কোন ইলাহ বানিয়ে দাও যেমন তাদের ইলাহ আছে।'
(সুরা-আল-আরাফ : ১৩৮)

ওই রূপ সাহাবাগণের মধ্যে কেউ কেউ বলেছিলেন :

اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ أَنْوَاتٍ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .ِنَّ هذَا نَظِيْرُ قَوْلُ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ (اجْعَل لَّنَا إِلَـهًا كَمَا لَهُم آلِهَةٌ)

'আমাদের জন্য যাতে আনওয়াত প্রতিষ্ঠা করে দিন। তখন নবী (সা.) শপথ করে বললেন : এটা তো বনী ইসরাইলদের মত কথা যা তারা মূসা (আ.)-কে বলেছিল : আমাদের জন্যও একটা ইলাহ বানিয়ে দাও তাদের ইলাহর মত।'
(সুনানে তিরমিযী : ২১৮০, ইমাম তিরমিযীর মতে হাদিসটি হাসান-সহীহ; মুসনাদে আহমাদ : ২১৮৯৭)

ত্রয়োদশ অধ্যায়
যারা শিরক্ করার ইচ্ছা পোষণ করে অতঃপর তওবা করে তাদের সম্বন্ধে হুকুম

মুসলিমদের মধ্যে যখন কোন এক প্রকারের শিরক্ করার ইচ্ছা অজ্ঞাতসারে অনুপ্রবেশ করে, তারপর তারা তা হতে তওবা করে, তাদের সম্বন্ধে হুকুম কি?

মুশরিকদের মনে একটা সন্দেহের উদ্রেক হয় যা তারা একটি ঘটনার সঙ্গে জড়িয়ে বর্ণনা করে। আর তা হচ্ছে এই যে, তারা বলে : বনী ইসরাইলরা–'আমাদের জন্য ইলাহ বানিয়ে দিন'–একথা বলে কাফির হয়ে যায় নি। অনুরূপভাবে যারা বলেছিল : আমাদের জন্য 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করে দিন, তারাও কাফির হয়ে যায়নি।

এর জবাব হচ্ছে এই যে, বনী ইসরাইলেরা যে প্রস্তাব পেশ করেছিল তা তারা কাজে পরিণত করে নি, তেমনই ভাবে যারা রসুলুল্লাহ (সা.)-কে 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করে দিতে বলেছিলেন তারাও তা করেন নি। বনী ইসরাইল যদি তা করে ফেলতো, তবে অবশ্যই তারা কাফির হয়ে যেতো। এ বিষয়ে কারো কোন ভিন্ন মত নেই। একই রূপে এই বিষয়েও কোন মতভেদ নেই যে, রসুলুল্লাহ (সা.) যাদেরকে 'যাতে আনওয়াত'-এর ব্যাপারে নিষেধ করেছিলেন তারা যদি নবী (সা.) এর হুকুম অমান্য করে– নিষেধ অগ্রাহ্য করে 'যাতে আনওয়াত' প্রতিষ্ঠা করতেন তাহলে তারাও কাফির হয়ে যেতেন, আর এটাই হচ্ছে আমাদের বক্তব্য।

এই ঘটনা থেকে এই শিক্ষা পাওয়া যাচ্ছে যে, কোন মুসলিম বরং আলেম কখনও কখনও শিরক্ এর বিভিন্ন প্রকরণে লিপ্ত হয় কিন্তু সে তা উপলব্ধি করতে পারে না, ফলে এ থেকে বাঁচার জন্য শিক্ষা ও সতর্কতার প্রয়োজন আছে। আর মূর্খরা যে বলে–আমরা তাওহীদ বুঝি, এটা তাদের সবচেয়ে বড় মূর্খতা এবং তা হচ্ছে শয়তানের চক্রান্ত জাল।

আর এটাও জানা গেল যে, কোন মুজতাহিদ মুসলিমও যখন না জেনে না বুঝে কুফরি কথা বলে ফেলেন, তখন তার ভুল সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি যদি সেটা বুঝে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে তওবা করেন তা হলে তিনি কাফির হবেন না, যেমন বনী ইসরাইল করেছিল এবং যারা 'যাতে আনওয়াত' এর সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেছিল। আর এর থেকে এটাও বুঝা যাচ্ছে যে, তারা কুফরি না করলেও তাদেরকে কঠোরভাবে ধমকাতে হবে যেমন নবী (সা.) করেছিলেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে উচ্চারণই যথেষ্ট নয়

যারা মনে করে যে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বলাই তাওহীদের জন্য যথেষ্ট, বাস্তবে তার বিপরীত কিছু করলেও ক্ষতি নেই, তাদের ভ্রান্ত ধারণা খণ্ডন।

মুশরিকদের মনে আর একটা সংশয় বদ্ধ-মূল হয়ে আছে। তা হলো এই যে, তারা বলে থাকে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালিমা পাঠ করা সত্ত্বেও হযরত উসামা (রা.) যাকে হত্যা করেছিলেন, নবী (সা.) সেই হত্যাকাণ্ডটাকে সমর্থন করেন নি। এইরূপ রসুলুল্লাহ (সা.) এর এই হাদিসটিও তারা পেশ করে থাকে যেখানে তিনি বলেছেন : 'আমি লোকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি যে পর্যন্ত না তারা বলে (মুখে উচ্চারণ করে) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'।'
(সহীহ বুখারী : ৩৮৫, ১৩৩৫, সহীহ মুসলিম : ১৩৩, ১৩৭ ইত্যাদি আরো অনেক সনদ রয়েছে)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর উচ্চারণকারীদের হত্যা না করা সম্বন্ধেও আরও অনেক হাদিস তারা তাদের মতের সমর্থনে পেশ করে থাকে।

এই অজ্ঞদের এসব প্রমাণ পেশ করার উদ্দেশ্য হচ্ছে এই যে, যারা মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করবে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না এবং তারা যা ইচ্ছা তাই করুক, তাদেরকে হত্যা করাও চলবে না।

এই সব অজ্ঞ মুশরিকদের বলে দিতে হবে যে, একথা সর্বজনবিদিত যে, রসুলুল্লাহ (সা.) ইয়াহুদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন এবং তাদেরকে বন্দি করেছেন যদিও তারা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতো।

আর রসুলুল্লাহ (সা.)-এর সাহাবাগণ বানু হানীফার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন যদিও তারা সাক্ষ্য দিয়েছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর রসুল; তারা সালাতও পড়তো এবং ইসলামেরও দাবি করতো।

ওই একই অবস্থা তাদের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য যাদেরকে হযরত আলী (রা.) আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছিলেন। এছাড়া ওই সব মূর্খরা স্বীকার করে যে, যারা পুনরুত্থানকে অস্বীকার করে তারা কাফির হয়ে যায় এবং হত্যারও যোগ্য হয়ে যায়—তারা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সত্ত্বেও। অনুরূপভাবে যে ব্যক্তি ইসলামের পঞ্চম স্তম্ভের যে কোন একটিকে অস্বীকার করে, সে কাফির হয়ে যায় এবং সে হত্যার যোগ্য হয় যদিও সে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে। তা হলে ইসলামের একটি অঙ্গ অস্বীকার করার কারণে যদি তার 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ তার কোন উপকারে না আসে, তবে সকল রসুলগণের প্রচারিত দ্বীন এর মূল ভিত্তি যে তাওহীদ এবং তা হচ্ছে ইসলামের মুখ্য বস্তু, যে ব্যক্তি সেই তাওহীদকেই অস্বীকার করলো তাকে ওই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর উচ্চারণ কেমন করে বাঁচাতে সক্ষম হবে? কিন্তু আল্লাহর দুশমনরা হাদিসসমূহের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করে না।

হযরত উসামা (রা.)-এর হাদিসের তাৎপর্য হচ্ছে এই যে, তিনি একজন ইসলামের দাবিদারকে হত্যা করেছিলেন এই ধারণায় যে, সে তার জান ও মালের ভয়েই ইসলামের দাবি জানিয়েছিল।

কোন মানুষ যখন ইসলামের দাবি করবে তার থেকে ইসলাম বিরোধী কোন কাজ প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত সে তার জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। এ সম্বন্ধে আল-কুরআনের ঘোষণা এই যে :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ فَتَبَيَّنُواْ (النساء : 94)

'হে মু'মিনগণ! যখন তোমরা আল্লাহ্র পথে যাত্রা করবে তখন কে বন্ধু আর কে শত্রু তা পরীক্ষা করে নেবে।' (সুরা-আন্-নিসা : ৯৪)

অর্থাৎ তার সম্বন্ধে তথ্যাদি নিয়ে দৃঢ়ভাবে সুনিশ্চিত হও। এই আয়াত পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে যে, এরূপ ব্যাপারে হত্যা থেকে বিরত থেকে তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়া অবশ্য কর্তব্য। তদন্তের পর যদি তার ইসলাম বিরোধিতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় তবে তাকে হত্যা করা যাবে। যেমন আল্লাহ বলেছেন, فَتَبَيَّنُواْ অর্থাৎ তদন্ত করে দেখ। তদন্ত করার পর দোষী সাব্যস্ত হলে হত্যা করতে হবে। যদি এই অবস্থাতে হত্যা না করা হয় তাহলে : 'ফাতাবাইয়ানু' অর্থাৎ স্থির নিশ্চিত হওয়ার কোন অর্থ হয় না।

এইভাবে অনুরূপ হাদিসগুলোর অর্থ বুঝে নিতে হবে। ওইগুলোর অর্থ হবে যা আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি। অর্থাৎ যে ব্যক্তির মধ্যে তাওহীদ ও ইসলাম প্রকাশ্যভাবে পাওয়া যাবে তাকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকতে হবে- যে পর্যন্ত বিপরীত কোন কিছু প্রকাশিত না হবে। এ কথার দলিল হচ্ছে যে, রসুলুল্লাহ (সা.) কৈফিয়তের ভাষায় উসামা (রা.)-কে বলেছিলেন :

'তুমি হত্যা করেছ 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার পরও?

(সহীহ বুখারী : ৪০২১, সহীহ মুসলিম : ২৮৮)

রসুল (সা.) আরও বলেছিলেন :

'আমি লোকদেরকে হত্যা করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা বলবে : 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। (সহীহ বুখারী : ৩৮৫, ১৩৩৫, সহীহ মুসলিম : ১৩৩)

সেই রসুলই (সা.) খারেজিদের সম্বন্ধে বলেছেন :

اَيْنَمَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاقْتُلُوْهُمْ لَئِنْ اَدْرَكْتُهُمْ لاَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ (متفق عليه)

অর্থাৎ 'যেখানেই তোমরা তাদের পাবে, হত্যা করবে, আমি যদি তাদের পেয়ে যাই তবে তাদেরকে হত্যা করব 'আদ জাতির মত সার্বিক হত্যা।'

(সহীহ বুখারী : ৬৯৯৫ ও সহীহ মুসলিম : ২৪৯৯)

যদিও তারা ছিল লোকদের মধ্যে অধিক 'ইবাদাত গুজার, অধিক মাত্রায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং সুবাহানাল্লাহ উচ্চারণকারী।

খারেজিরা এমন বিনয়-নম্রতার সঙ্গে সালাত আদায় করতো যে, সাহাবাগণ পর্যন্ত নিজেদের সালাতকে তাদের সালাতের তুলনায় তুচ্ছ মনে করতেন। তারা কিন্তু ইলম শিক্ষা করেছিল সাহাবাগণের নিকট হতেই। কিন্তু তাদের 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা, তাদের অধিক পরিমাণ ইবাদাত করা এবং তাদের ইসলামের দাবি করা কোনই উপকারে আসলো না যখন তাদের থেকে শরীয়াতের বিরোধী বিষয় প্রকাশিত হয়ে গেলো।

ওই একই পর্যায়ের বিষয় হচ্ছে ইহুদীদের হত্যা এবং বানু হানীফার বিরুদ্ধে সাহাবাদের যুদ্ধ ও হত্যাকাণ্ড। ওই একই কারণে নবী (সা.) বনু মুস্তালিক গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন যখন তাঁকে একজন লোক এসে খবর দিল যে, তারা যাকাত দেবে না। এই সংবাদ এবং অনুরূপ অবস্থায় তদন্তের পর স্থির নিশ্চিত হওয়ার জন্য আল্লাহ তাআ'লা আয়াত নাযিল করলেন :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا (الحجرات : 6)

'হে মু'মিনগণ! কোন পাপাচারী যদি তোমাদের কাছে কোন খবর নিয়ে আসে, তাহলে তার সত্যতা যাচাই করে নাও।' (সুরা-আল-হুজরাত : ৬)

উপরোক্ত সংবাদদাতা তাদের সম্বন্ধে মিথ্যা সংবাদ দিয়েছিল।

এইরূপে রসুলুল্লাহ (সা.)-এর যে সমস্ত হাদিসকে তারা হুজ্জত রূপে পেশ করে থাকে তার প্রত্যেকটির তাৎপর্য তাই যা আমরা উল্লেখ করেছি।

পঞ্চদশ অধ্যায়

জীবিত ও মৃত ব্যক্তির নিকট সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য

উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট তার আয়ত্তাধীন বিষয়ে সাহায্য কামনা এবং অনুপস্থিত ব্যক্তির নিকট তার ক্ষমতার অতীত বিষয়ে সাহায্য কামনার মধ্যে পার্থক্য।

তাদের (মুশরিকদের) মনে একটি সন্দেহ বদ্ধ-মূল হয়ে আছে আর তা' হচ্ছে এই : নবী (সা.) বলেছেন, 'মানবজাতি কিয়ামত দিবসে প্রথমে সাহায্য কামনা করবে হযরত আদম (আ.)-এর নিকট, তারপর নূহ (আ.)-এর নিকট, তারপর হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর নিকট, অতঃপর হযরত ঈসা (আ.) এর নিকট।' (সহীহ বুখারী : ৪৭১২, সহীহ মুসলিম : ১৯৪)

তাঁরা প্রত্যেকেই তাদের অসুবিধার উল্লেখ করে ওজর পেশ করবেন, শেষ পর্যন্ত মানুষ রসুলুল্লাহ (সা.)-এর নিকট গমন করবে।

তারা বলে : এর থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকটে সাহায্য চাওয়া শিরক্ নয়।

আমাদের জবাব হচ্ছে : আল্লাহর কি মহিমা। তিনি তাঁর শত্রুদের হৃদয়ে মোহর মেরে দিয়েছেন।

সৃষ্ট জীবের নিকটে তার আয়ত্বাধীন বিষয়ে সাহায্য চাওয়ার বৈধতা আমরা অস্বীকার করি না।

যেমন আল্লাহ তাআ'লা হযরত মূসা (আ.)-এর ঘটনায় বলেছেন :

فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ (القصص : 15)

'তখন তার দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার কাছে সাহায্যের আবেদন জানালো।' (সুরা-আল-কাসাস : ১৫)

মানুষ তার সহচরদের নিকটে যুদ্ধে বা অন্য সময়ে ওই বিষয়ে সাহায্য চায় যা মানুষের আয়ত্বাধীন। কিন্তু আমরা তো ওই রূপ সাহায্য প্রার্থনা অস্বীকার করেছি যা ইবাদাত স্বরূপ মুশরিক্গণ করে থাকে ওলীদের কবর বা মাজারে, অথবা তাদের অনুপস্থিতিতে কিংবা এমন সব ব্যাপারে তাদের সাহায্য কামনা করে যা মঞ্জুর করার ক্ষমতা আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই নেই।

যখন আমাদের এ বক্তব্য সাব্যস্ত হল : তখন জেনে রাখো, নবীদের নিকটে কিয়ামতের দিন সাহায্য কামনা করা হবে যাতে তাঁরা আল্লাহর কাছে দোয়া করেন যেন তিনি জান্নাতবাসীর হিসাব (সহজ ও শীঘ্র) সম্পন্ন করে হাশরের ময়দানে অবস্থানের কষ্ট হতে মুক্তি দান করেন। এ ধরনের সাহায্য কামনা

দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই সিদ্ধ। যেমন জীবিত কোন নেক লোকের নিকটে তুমি গমন করে বললে : আপনি আমার জন্য আল্লাহর নিকটে দোয়া করুন। যেমন নবী (সা.)-এর সাহাবীগণ তাঁর জীবিতকালে তাঁর নিকট অনুরোধ জানাতেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর কবরের নিকট গিয়ে এই ধরনের অনুরোধ কক্ষনো তাঁরা জানান নি। বরং সালাফুস সালিহ বা পূর্ববর্তী লোকগণ তাঁর কবরের নিকট গিয়ে আল্লাহকে ডাকতে (এবং সেটাকে অবাঞ্ছিত কাজ মনে করে তাতে সম্মতি দিতে) অস্বীকার করেছেন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে কি করে স্বয়ং তাঁকেই ডাকা যেতে পারে?

তাদের মনে আর একটা সংশয় রয়েছে হযরত ইব্রাহীম (আ.) এর ঘটনায়। যখন তিনি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হন তখন শূন্যলোক হতে জিব্রাইল (আ.) তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কি কোন প্রয়োজন আছে? তখন ইব্রাহীম (আ.) বলেছেন : যদি বলেন, আপনার নিকটে, তবে আমার কোনই প্রয়োজন নেই।

তারা (মুশরিকরা) বলে : জিব্রাইল (আ.) নিকট সাহায্য কামনা করা যদি শিরক্ হতো তাহলে তিনি কিছুতেই হযরত ইব্‌রাহীম (আ.)-এর নিকট উক্ত প্রস্তাব পেশ করতেন না। এর জবাব হচ্ছে : এটা প্রথম শ্রেণির সন্দেহের পর্যায়ভুক্ত। কেননা জিব্রাইল (আ.) তাঁকে এমন এক ব্যাপারে উপকৃত করতে চেয়েছিলেন যা করার মত ক্ষমতা ছিল তার আয়ত্বাধীন। আল্লাহ স্বয়ং তাঁকে 'অত্যন্ত শক্তিশালী' বলে উল্লেখ করেছেন। হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর জন্য প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ড এবং তার চারদিকের জমি ও পাহাড় যা কিছু ছিল সেগুলো ধরে পূর্ব ও পশ্চিম দিকে তিনি নিক্ষেপ করতে পারতেন যদি আল্লাহ অনুমতি দিতেন। যদি আল্লাহ ইব্রাহীম (আ.)-কে দুশমনদের নিকট থেকে দূরবর্তী কোথাও স্থানান্তরিত করতে আদেশ দিতেন, তাও তিনি অবশ্যই করতে পারতেন আর আল্লাহ যদি তাকে আকাশে তুলতে বলতেন, তাও তিনি করতে সক্ষম হতেন।

তাদের সংশয়ের বিষয়টি তুলনীয় এমন একজন বিত্তশালী লোকের সঙ্গে যার প্রচুর ধন দৌলত রয়েছে। সে একজন অভাবগ্রস্ত লোক দেখে তার অভাব মিটানোর জন্য তাকে কিছু অর্থ ধার স্বরূপ দেওয়ার প্রস্তাব করলো অথবা তাকে কিছু টাকা অনুদান স্বরূপ দিয়েই দিল। কিন্তু সেই অভাবগ্রস্ত লোকটি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করল এবং কারোর কোন অনুগ্রহের তোয়াক্কা না করে আল্লাহর রিযিক না পৌছা পর্যন্ত ধৈর্য্য অবলম্বন করল। তাহলে এটা বান্দার নিকট সাহায্য কামনা এবং শিরক্ কেমন করে হল? আহা যদি তারা বুঝতো।

ষোড়শ অধ্যায়
তাওহীদ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতা ও অপারগতার পরিচয়

আমি এবার ইনশাআল্লাহ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করে আমার বক্তব্যের উপসংহার টানবো। পূর্ব আলোচনা সমূহে এ বিষয়ের উপর আলোকপাত হয়েছে বটে কিন্তু তার বিশেষ গুরুত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে এবং সে সম্পর্কে প্রচুর ভুল ধারণার সৃষ্টি হওয়ার ফলে আমি সে বিষয়ে এখানে পৃথকভাবে কিছু আলোচনা করতে চাই।

এ বিষয়ে কোনই দ্বিমত নেই যে, তাওহীদ তথা আল্লাহর একত্ববাদের স্বীকৃতি হতে হবে অন্তর দ্বারা, মুখ দ্বারা এবং কাজের মাধ্যমে তার বাস্তবায়ন দ্বারা। এর থেকে যদি কোন ব্যক্তির কিছুমাত্র বিচ্যুতি ঘটে, তবে সে মুসলিম বিবেচিত হবে না।

যদি কোন ব্যক্তি তাওহীদ কী-তা জানে কিন্তু তার উপর আমল না করে, তবে সে হবে হঠকারী কাফির, তার তুলনা হবে ফেরাউন, ইবলিস প্রভৃতির সঙ্গে। এখানেই অধিক সংখ্যক লোক বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হয়েছে। তারা বলে থাকে : এটা সত্য, আমরা এটা বুঝি এবং তার সত্যতার সাক্ষ্যও দিচ্ছি। কিন্তু আমরা তা কাজে পরিণত করতে সক্ষম নই। আর আমাদের দেশবাসীদের নিকট তা কল্যাণকর নয়-কিন্তু যারা তাদের সঙ্গে একাত্মতা পোষণকারী (তারা ছাড়া)। এই সব ওজুহাত এবং অন্যান্য ওজর আপত্তি তারা পেশ করে থাকে।

আর এই হতভাগারা বুঝে না যে, অধিকাংশ কাফির নেতা এ সত্যটা জানত কিন্তু জেনেও তা প্রত্যাখ্যান করতো শুধু কতিপয় ওজর আপত্তির জন্য। যেমন আল্লাহ তাআ'লা বলেছেন :

اشْتَرَوْا بِآيَاتِ اللهِ ثَمَنًا قَلِيلاً (التوبة : 9)

'আল্লাহ্‌র আয়াতকে তারা (দুনিয়াবী স্বার্থে) অতি তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছে।' (সুরা-আত-তাওবাহ্ : ৯)

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে :

يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءهُمْ (البقرة : 146)

'তারা তাকে (রসুল (সা.)-কে) সে রকমই চিনে, যেমন চিনে নিজের পুত্রদেরকে।' (সুরা–আল-বাকারা : ১৪৬)

আর কেউ যদি তাওহীদ না বুঝে লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে তার উপর আমল করে অথবা সে যদি অন্তরে বিশ্বাস না রেখে আমল করে তবে তো সে মুনাফিক, সে নিরেট কাফির থেকেও মন্দ।

স্বয়ং আল্লাহ মুনাফিকদের পরিণতি সম্বন্ধে বলেছেন :

نَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (النساء : 145)

'নিশ্চয় মুনাফিকরা অবস্থান করবে জাহান্নামের নিম্নতম স্তরে।'

(সুরা–আন-নিসা : ১৪৫)

এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর, অতীব দীর্ঘ ও ব্যাপক। আপনার নিকটে এটা তখনই প্রকাশ হয়ে যাবে যখন আপনি এই আলোচনার উপর গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন। তখন আপনি দেখবেন, সত্যকে জেনে বুঝেও তারা তার উপরে আমল করে না এই আশঙ্কায় যে, তাদের পার্থিব ক্ষতি হবে।

আপনি আরও দেখতে পাবেন যে, কিছু লোক প্রকাশ্যভাবে কোন কাজ করছে কিন্তু তাদের অন্তরে তা নেই। তাকে তার অন্তরের প্রত্যয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করলে দেখা যাবে যে, সে তাওহীদ কি-তা বুঝে না।

অবস্থার এই প্রেক্ষিতে মাত্র দুটি আয়াতের তাৎপর্য হৃদয়ংগম করা আপনার কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। প্রথমটি হচ্ছে :

لاَ تَعْتَذِرُواْ قَدْ كَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَانِكُمْ (التوبة : 66)

'ওযর পেশের চেষ্টা করো না, ঈমান আনার পর তোমরা কুফরি করেছ।'

(সুরা-আত্-তাওবাহ্ : ৬৬)

যখন এটা সাব্যস্ত হয়েছে যে, কতিপয় লোক যারা রসুল (সা.)-এর সঙ্গে রুমের (তাবুকের) যুদ্ধে গমন করেছিল, তারা ঠাট্টাচ্ছলে কোন কথা বলার জন্য কাফির হয়ে গিয়েছিল। আর এটাও আপনার কাছে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, হাসি ঠাট্টার সাথে কথা বলার চেয়ে অধিক গুরুতর সেই ব্যক্তি যে ধনদৌলতের ক্ষতির আশঙ্কায় কিংবা সম্মানহানি কিংবা সম্পর্কের ক্ষতির ভয়ে কুফরি কথা বলে অথবা কুফরির উপরে আমল করে।

দ্বিতীয় আয়াতটি হচ্ছে :

مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَـكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ - ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ (النحل : 106-107)

'কোন ব্যক্তি তার ঈমান গ্রহণের পর আল্লাহ্‌কে অবিশ্বাস করলে এবং কুফরীর জন্য তার হৃদয় খুলে দিলে তার উপর আল্লাহ্‌র গযব পতিত হবে আর তার জন্য আছে মহা শাস্তি, তবে তার জন্য নয় যাকে (কুফরীর জন্য) বাধ্য করা হয় অথচ তার মন ঈমানের উপর অবিচল থাকে। এর কারণ এই যে, তারা আখিরাত অপেক্ষা দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবাসে।'

(সূরা–আন-নাহল : ১০৬-১০৭)

আল্লাহ এদের কারোরই ওজর আপত্তি কবুল করবেন না, তবে কবুল করবেন শুধু তাদের ওজর আপত্তি যাদের অন্তর ঈমানের উপরে স্থির ও প্রশান্ত রয়েছে কিন্তু তাদেরকে জবরদস্তি করে কুফ্‌রী করতে বাধ্য করা হয়েছে। এরা ছাড়া উপরোল্লিখিত ব্যক্তিরা তাদের ঈমানের পর কুফরি করেছে। চাই তারা ভয়েই তা করে থাকুক অথবা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় হোক কিংবা তার গোত্রের, দেশের বা স্বজনদের প্রতি অনুরাগের জন্যই হোক অথবা হাসি ঠাট্টা ছলেই কুফরি কথা উচ্চারণ করুক অথবা এ ছাড়া অন্য যে কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য তা করে থাকুক কিন্তু বাধ্যবাধকতা ছাড়া। সুতরাং বর্ণিত আয়াতটি এই অর্থই বুঝিয়ে থাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে।

প্রথমত. আল্লাহর সেই বাণী যাতে বলা হয়েছে, 'কিন্তু যদি তাকে বাধ্য করা হয়ে থাকে।' আল্লাহ বাধ্যকৃত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন ব্যতিক্রমের সুযোগ রাখেন নি। একথা সুবিদিত যে, মানুষকে একমাত্র কথা অথবা কাজের মাধ্যমেই বাধ্য করা যায়। কিন্তু অন্তরের প্রত্যয়ে কাউকে বাধ্য করা চলে না।

দ্বিতীয়ত. আল্লাহর বাণী :

ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ اسْتَحَبُّواْ الْحَيَاةَ الْدُّنْيَا عَلَى الآخِرَةِ (النحل : 107)

'এর কারণ এই যে, তারা আখিরাত অপেক্ষা দুনিয়ার জীবনকে বেশি ভালোবাসে।' (সুরা-আন্-নাহল : ১০৭)

এ আয়াতটি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, এই কুফরি ও তার শাস্তি তাদের 'ইতেকাদ', অজ্ঞতা, দ্বীন এর প্রতি বিদ্বেষ বা কুফরীর প্রতি অনুরাগের কারণে নয়, বরং এর একমাত্র কারণ হচ্ছে তারা দুনিয়া থেকে কিছু অংশ হাসিল করতে গিয়ে দুনিয়াকে আখিরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে।

পাক পবিত্র ও মহান আল্লাহই এ সম্পর্কে অধিক অবহিত রয়েছেন আর সকল প্রশংসা জগৎ সমূহের রব আল্লাহর জন্য।

و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین و سلم آمین

আর আল্লাহ তাআ'লার অনুগ্রহ বর্ষিত হোক আমাদের নবী মুহাম্মদ (সা.) এর উপর ও তাঁর পরিবার ও সকল সাহাবীদের উপর এবং তাঁদের সকলের উপর আল্লাহ শান্তি অবতীর্ণ করুন। আমিন

বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত মুহাম্মাদ (সা.)-এর সমকালীন যুগে আবু জেহেল, আবু লাহাব তথা মক্কার কুরাইশরা আল্লাহকে সৃষ্টিকর্তা-রিযিকদাতা হিসেবে স্বীকার করার পরও কেন মুশরিক-কাফির হিসেবে গণ্য হয়েছিলো? তাদের সাথে মুসলিমদের ঈমানের পার্থক্য কোথায়? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর প্রকৃত ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য আমরা কি জানি? এটা না-জেনে জাহান্নাম থেকে নিরাপদ থাকা যাবে কি?

মুসলিম হওয়ার জন্য শুধুমাত্র মুখে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' উচ্চারণ করাই কি যথেষ্ট? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সাক্ষ্য দেওয়ার পরও কি মানুষ কাফির হতে পারে? সালাত-সিয়াম-যাকাত ও অন্যান্য ফরজ ইবাদাতসমূহ পালন করার পর ঈমান বিনষ্টকারী কাজ করলেও কি মুসলিম থাকা যায়? এসব ঈমান বিনষ্টকারী কাজসমূহ কী কী তা কি আমরা জানি?

এই যুগে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বাস্তবে মেনে চলা অসম্ভব—এই ধারণা কি সঠিক? ইসলামের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য 'অপারগতা'র সংজ্ঞা কী? বিশ্ব বরেণ্য ইসলামী চিন্তাবিদ শায়খুল ইসলাম মুহাম্মাদ বিন সুলাইমান আত্তামীমী (রহ.) ঈমান সংক্রান্ত এ রকম গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলোর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন এই 'আপনার ঈমান কি আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য? (সংশয় নিরসন)' গ্রন্থে।

Published by

Pandulipi Prokashon
Manikpir Road, Kumarpara, Sylhet.
Mobile : 01712868329
ISBN : 978-984-8922-10-1